মনের খেলা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নবজীবন সংঘ

৫।এ, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা

নবজীবন সংঘ

৫।এ, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা

হইতে

শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য এক টাকা

প্রিণ্টার শ্রীআশুতোষ ভড়

শক্তি প্রেস

২৭।৩ বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

এই গ্রন্থের পাতাগুলিতে যাঁহারা গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় খুঁজিবেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন—এই কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা ভালো। আমাদের দেশের শতকরা নব্বুই জনের বেশী নরনারী জ্ঞানের জগতে আজ পঙ্গু হইয়া আছে। ইহার জন্য আমরা—ইংরাজীশিক্ষিত লোকেরা—কতক পরিমাণে দায়ী। পাশ্চাত্যের বহুপণ্ডিত আপনাদের অক্লান্ত সাধনার দ্বারা জ্ঞানের নব নব রাজ্য আবিষ্কার করিতেছেন। সেই সকল রাজ্যের রহস্যের সহিত তাঁহারা দেশের জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। সে দেশের যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত তাঁহারা অনেক দুরূহ বিষয় লইয়া জনসাধারণের জন্য সরলভাষায় পুস্তক রচনা করেন। মাতৃভাষায় তাঁহাদের লিখিত সেই সকল বই পড়িয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা জ্ঞানের অমৃতফল নিজেরাই ভোগ করেন—অন্যকে ভাগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না অথবা অল্প ইংরাজী জানেন তাঁহারা মনের খোরাক খুঁজিয়া ফিরেন মাসিক পত্রিকাগুলির গল্পলহরীর মধ্যে। ইংরাজী না জানার জন্য জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যের সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই। দেখেন, সেই বিস্তীর্ণরাজ্যের প্রবেশদ্বারে লেখা রহিয়াছে No Admission অর্থাৎ প্রবেশ নিষেধ। কাঙাল নয়ন নৈরাশ্য বহন করিয়া সেই দ্বার হইতে ফিরিয়া আসে। ইংরাজী-না-জানা এই লক্ষ লক্ষ মানুষের তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ের বেদনা যদি আমরা অনুভব করিতে পারিতাম তবে বাঙ্গলাভাষা নব নব জ্ঞানের সম্পদে আরও ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠিত

জনসাধারণের মনের অন্ধকার বহুল পরিমাণে ঘুচিয়া যাইত। 'মনের খেলা' তাঁহাদেরই জন্য লিখিত হইল যাঁহারা ইংরাজী জানেন না অথবা ইংরাজীভাষার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত নহেন। অত্যন্ত দুঃখ এবং লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে, এই পুস্তক বহু ইংরাজীশব্দে কণ্টকিত হইয়া আছে। যদি সুযোগ পাই তবে নূতন সংস্করণে এই ভুলের সংশোধন করিব। সাইকো-এ্যানালিসিস্ অথবা মনের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা মোটা বিষয় লইয়া এখানে আলোচনা করা হইয়াছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কলিকাতা
২২।৩।৩৪

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরিবর্দ্ধিত আকারে মনের খেলার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। ইংরেজীর সর্ব্বত্র অনুবাদ দেওয়া উচিত ছিল, নানা কারণে এই ত্রুটী এবারেও রহিয়া গেল। বিধাতার আশীর্ব্বাদে যদি তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিবার কোনদিন সৌভাগ্য ঘটে—এই ত্রুটী সারিয়া লইব।

৫।এ, অন্নদা নিয়োগী লেন,
কলিকাতা
শিবরাত্রি, ১৩-২-৪২

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মনের খেলা

চেতন ও অবচেতন—নদীর বুকে ঢেউএর পরে ঢেউ জাগে, মনের মধ্যেও তেমনি চিন্তার পর চিন্তা জাগে। ঢেউ জলের ভিতর হইতে উঠিয়া জলের ভিতরেই আবার মিলাইয়া যায়; চিন্তাও মনের অতল হইতে উঠিয়া আবার মনের অতলেই আত্মগোপন করে। নদীর বুকে ঢেউএর ওঠা-পড়ার যেমন বিরাম নাই, মনের মধ্যেও চিন্তার তরঙ্গ তেমনি কেবলই উঠিতেছে, কেবলই পড়িতেছে।

মনের উপরিভাগে যখন একটী চিন্তা জাগিয়া থাকে তখন অন্যান্য চিন্তা মনের অতলে অপেক্ষা করে উপরে উঠিবার জন্য। যে চিন্তাটী চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে সেটী কিছুক্ষণ পরে বিস্মৃতির রাজ্যে চলিয়া যায়। চেতনার রাজ্যে নূতন নূতন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় নেপথ্যের অন্ধকার

হইতে। মন যেন থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চে নট-বালকেরা নাচিয়া গাহিয়া নেপথ্যে চলিয়া যায়। নূতন অভিনেতারা আসে নূতন ভূমিকা লইয়া নেপথ্য হইতে প্রকাশ্যে। থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে নেপথ্য হইতে প্রকাশ্যে এবং প্রকাশ্য হইতে নেপথ্যে অভিনেতাদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব কেবলই ঘটিতেছে। মনের রঙ্গমঞ্চেও তাই। বিস্মৃতিব অন্ধকার হইতে চেতনার আলোকে এবং চেতনার আলোক হইতে বিস্মৃতির অন্ধকারে চিন্তার ছুটাছুটির বিরাম নাই।

মনের যে দিকটা চেতনার আলোকে আলোকিত তাহাকে মনস্তত্ত্ববিদেরা বলে Conscious state. মনের যে দিকটা চেতনার রাজ্যের বহির্ভূত, যে দিকটা বিস্মৃতির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সেই দিকটার নাম Sub-conscious state বা আন্তর্জ্ঞানিক অবস্থা। এই আন্তর্জ্ঞানিক প্রদেশে অলক্ষ্যে কত চিন্তাই যে লুকাইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা জীবনে যত কিছু চিন্তা করি তাহার কোনটাই একেবারে নষ্ট হয় না। সেগুলি চেতনার রাজ্য হইতে বিস্মৃতির রাজ্যে চলিয়া যায়। সেই বিপুল অন্ধকারের রহস্যময় রাজ্যে কতদিনের কত আশা-আকাঙ্ক্ষাই না লুকাইয়া আছে। কবে শৈশবের সোনালি প্রভাতে মা আমার চিবুক ধরিয়া

মাথা আঁচড়াইয়া দিয়াছে, ঠাকুরমা ভোরের বেলায় কৃষ্ণের শতনাম শুনাইয়াছে, আহার করাইবার সময় রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলিয়াছে, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অভিমন্যুবধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়াছে—পুস্তক লিখিতে লিখিতে একে একে কত কথাই না মনে পড়িতেছে। সে কতকালের কথা! বাল্যে শনিবারের ছুটির পর বনে বনে ঘুরিয়া বৈঁচি তুলিয়া খাইতাম, বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গেলে সমপাঠীদের সহিত মাঠে যাইতাম—শ্যামল প্রান্তরে বসিয়া শীতের রৌদ্রালোকে মটরসূটী খাইতে কত ভালো লাগিত! এতক্ষণ এইসব ছবি কোথায় আত্ম-গোপন করিয়া ছিল? কোথায় ছিল আমার ছোট্ট চিবুকটীতে মায়ের হাতের সেই স্পর্শের স্মৃতি? মা ঘুমাইয়া থাকিত। পাছে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তাই ধীরে ধীরে খিল খুলিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে আম্রবনে পলাইয়া খেলা করিতাম। সেই চুরি করিয়া পালানোর কথাই বা এতদিন কোন্‌খানে লুক্কায়িত ছিল? কোথায় লুকাইয়া ছিল মটরসূটীর ক্ষেতের কথা, বনে বনে বৈঁচি খাওয়ার কথা? একটী বন্ধুর সহিত শীতের প্রত্যূষে তাহাদের বাগানে খেজুরের রস খাইতে যাইতাম। সে কথাও চেতনার আলোকে ভাসিয়া উঠিতেছে। দমদম জেলের কম্বল শয্যায় বসিয়া লিখিতে

লিখিতে মনের সামনে বায়স্কোপের ছবির মত শুধু ছবির পর ছবি জাগিতেছে। অনেকদিন তাহাদের কথা ভাবি নাই। কিন্তু একটী কথাও তো শূন্যের মধ্যে নিঃশেষ এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। নিঃশেষে মুছিয়া গেলে আজ তাহারা মনের আকাশে তারার মত এমন করিয়া একটীর পর একটী ফুটিয়া উঠিত না। আরও অনেক কথা। লজ্জার কথা, গৌরবের কথা, ভয়ের কথা, সাহসের কথা, দুঃখের কথা, সুখের কথা, সোহাগের কথা, শাসনের কথা—অনেক কথা মনের কোণে গুপ্ত হইয়া আছে, সুপ্ত হইয়া আছে বেদের হাঁড়িতে সাপের মত। আমি এখন যদি বাঁশি বাজাই তাহারা একে একে বাহির হইয়া আসিবে। মনের যে প্রদেশে অতীতের এবং বর্ত্তমানের শত শত আশা আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে তাহাই হইতেছে অবচেতনার প্রদেশ বা Sub-conscious state. সেই বিস্মৃতির কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রদেশে একদিন এই দমদম জেলের ছবিও মিলাইয়া যাইবে। সেদিন নূতন দৃশ্য চোখের সামনে জাগিয়া উঠিবে, চোখ দেখিবে নূতন মানুষের মুখ, কান শুনিবে নূতন মানুষের কণ্ঠধ্বনি। বর্ত্তমান সে দিন অতীতের গর্ভে ঢলিয়া পড়িবে, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মধ্যে আসিবে। এমনি করিয়া যাহাকে বর্ত্তমানে জানিতেছি রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্য দিয়া তাহা অতীতের মধ্যে নিমেষে নিমেষে

অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। যাহাকে পূর্ব্বে জানি নাই তাহাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জানিতেছি। কিন্তু সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটী সত্য আছে যাহা আমরা ভুলিব না। যাহা যায় তাহা নিঃশেষে মুছিয়া যায় না—তাহা মনের অতল প্রদেশে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

মনের এই অবচেতনার ক্ষেত্রকে আমরা চিত্তের চোরা কুঠরীও বলিতে পারি। অন্তরের অসংখ্য বৃত্তি বা চিন্তা চেতনার আলোকে দীপ্তিমান মনের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়া চোরা কুঠরীতে চলিয়া যায়। তখন তাহাদের কথা আমরা ভুলিয়া যাই। কোন কারণের সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহারা যখন তখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে পারে। খোকা অনেকদিন হইল ছাড়িয়া গিয়াছে। বহুদিন পরে তাহার ছোট্ট এক পাটি জুতা খোকার স্মৃতির চিতা বুকের মধ্যে জ্বালাইয়া দিল। মা জুতাটি লইয়া খোকার জন্য কাঁদে—যে খোকার কথা গৃহস্থালির কাজকর্ম্মের মধ্যে তাহার মনে হয় নাই। জুতাকে আশ্রয় করিয়া বিস্মৃতির রাজ্য হইতে খোকা আসিল এবং মায়ের শোকার্ত্ত হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল। দুষ্মন্তের হৃদয় হইতে শকুন্তলার স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছিল। কণ্বের তপোবনে প্রিয়ার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ, কুঞ্জকুটীরে প্রেয়সীর সহিত সেই গোপন মিলন, কানে কানে সেই কত সোহাগবাণী—দুষ্মন্ত সব ভুলিয়া

গিয়াছিল। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার মূলে এই বিস্মৃতি। তাহার পর ধীবর আসিয়া যখন শকুন্তলার হারানো অঙ্গুরীয়টী আনিয়া রাজাকে দেখাইল তখন রাজার একে একে সব কথা মনে পড়িয়া গেল। বিস্মৃতির দুয়ার খুলিয়া রাজার চেতনার রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইল কণ্বের দুহিতা শকুন্তলা; নবযৌবনা সুন্দরী যুবতী সখীদের সঙ্গে আলবালে জলসেচন করিতেছে। আরও কত কথা একে একে রাজার স্মৃতিপথে উদিত হইল। অঙ্গুরীয়কে আশ্রয় করিয়া বিস্মৃতির আবরণ ঠেলিয়া শকুন্তলা দুষ্মন্তের স্মৃতিপথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রাজাকে অনুশোচনার তীক্ষ্ণ শরে একেবারে জর্জ্জরিত, অভিভূত করিয়া দিল।

রবীন্দ্রনাথের 'স্পর্শমণি' কবিতার সনাতন গোস্বামী নদীতীরে পরশমাণিক কুড়াইয়া পাইয়া উহা অন্য কাহারও কাজে লাগিবে বলিয়া বালুকার নিম্নে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মানকরের দীন বিপ্র জীবন আসিয়া তাঁহার নিকট যখন ধন প্রার্থনা করিলেন তখন সাধুর প্রথমটা মাণিকের কথা মনেই পড়ে নাই। উহা বিস্মৃতির রাজ্যে লুকাইয়া ছিল। তাহার পর সহসা বিস্মৃতির দুয়ার খুলিয়া পরশমাণিক সাধুর চেতনারাজ্যে আসিয়া দেখা দিল। সনাতন গোস্বামী তখন জীবনকে গুপ্তধনের সন্ধান দিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

সূর্য্যমুখীর শূন্য শয়ন-গৃহে নগেন্দ্র একাকী যেদিন শয়ন করিতে গেলেন রোদন করিতে—সেদিন কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত প্রিয়তমার প্রিয়চিত্রগুলি দেখিয়া নগেন্দ্রের চেতনার ক্ষেত্রে অতীতের অনেক কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রতি চিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিয়াছিলেন। বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতীর ছবি দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িল, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। দেওয়ালে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার চিত্র দেখিয়া নগেন্দ্রের মনে পড়িল, সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন নগেন্দ্রের গাড়ী হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নী-বৎসল নগেন্দ্র অন্তঃপুরের উদ্যান মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটী ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া সূর্য্যমুখীর সে সাধ মিটাইয়াছিলেন। একদিন দোলে সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন। কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া দেওয়ালে লাগিয়াছিল। দেওয়ালে আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। সেই চিহ্ন দেখিয়া নগেন্দ্রের সব কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই রাত্রে নগেন্দ্র কত যে কাঁদিলেন তাহা কেহ জানিল না। যে সব কথা বহুদিন তাঁহার স্মরণ-পথে উদিত হয় নাই, যে সব কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন সূর্য্যমুখীর প্রিয় ছবিগুলি এবং

দেওয়ালে আবীরের চিহ্ন দেখিয়া নগেন্দ্রের সেই সব কথা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। ছবি এবং আবীরের চিহ্নকে আশ্রয় করিয়া অনেক দিবসের বিস্মৃত ঘটনাগুলি অতল অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়া নগেন্দ্রের চেতনার আলোকে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

কলিকাতার হোষ্টেলের ঘরে বসিয়া শীতের প্রভাতে একমনে অধ্যয়ন করিতেছি। হঠাৎ রেডিওতে বাজিয়া উঠিল সানাইয়ের সকরুণ তান। মন পাঠ্য বিষয় ছাড়িয়া ছুটিয়া গেল নদীর ধারে ছোট্ট গ্রামখানিতে;—আশ্বিনের ম্লান অপরাহ্নে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের আয়োজন চলিতেছে—সূর্য্যাস্তের করুণ আলো প্রতিমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে—শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। রেডিওর সানাইয়ের সুরে চিত্তপটে জাগিয়া উঠিল বিসর্জ্জনের একখানি বিষাদ-মাখা ছবি! শুধুই কি বিসর্জ্জনেরই ছবি জাগিল? সানাইয়ের তানে মনের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল অশ্রুসজল ভগ্নীর মুখচ্ছবি—পরিধানে রক্তচেলি, ললাটে শ্বেতচন্দন, পিতৃগৃহ ছাড়িয়া স্বামীর গৃহে চলিয়াছে। তাহাকে ঘিরিয়া মা, পিসিমা এবং অন্যান্য আত্মীয়ারা কাঁদিতেছে—আঁচল দিয়া তাহার আল্‌তা-পরা পা দুখানি মুছাইয়া দিতেছে আর বোনের চোখদুটী দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। বাংলাদেশের সানাইয়ের সুরের সঙ্গে প্রতিমা-বিসর্জ্জন এবং

পিতৃগৃহ ছাড়িয়া কন্যার প্রথম স্বামীগৃহে গমনের সকরুণ স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। তাই রেডিয়োর সুরে মনের অতল হইতে সহসা অনেক দিবসের ভুলিয়া যাওয়া ছবিখানি অমন করিয়া জাগিয়া উঠে।

এমনি করিয়াই যাহা বিস্মৃতির রাজ্যে একদিন চলিয়া যায় তাহা সহসা স্মৃতিপথে আসিয়া উদিত হয়, যাহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম সে আসিয়া কখন চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া দেয়, যাহার মুখের ছবি বহুদিন মনে পড়ে নাই সে কখন রাতের অন্ধকারে নিদ্রাহীন আঁখির আগে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অভিমান-ভরা ছলছল-চোখে নীরবে আমাদিগকে তিরস্কার করে। এমনি করিয়াই যাহা গোপনে ছিল তাহা আপনাকে প্রকাশ করে, যাহা অন্ধকারে ছিল তাহা আলোকে আসিয়া দাঁড়ায়। বাক্সে কাপড় খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ চোখে পড়ে পুরানো একখানি চিঠি—অতীত আসিয়া বর্ত্তমানের প্রয়োজনকে অমনি নিমেষে ভুলাইয়া দেয়। যাহা অত্যন্ত দূরের ছিল তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়—যাহা অত্যন্ত নিকটে ছিল তাহা দূর বিস্মরণের রাজ্যে চলিয়া যায়। এমনি করিয়া যাহা দূরের তাহা নিকটে আসিতেছে, যাহা নিকটের তাহা দূরে যাইতেছে: যাহা উপরের তাহা নীচের অতলে ডুবিতেছে, যাহা বিস্মৃতির অতলে নিমগ্ন ছিল

তাহা চেতনার ক্ষেত্রে উঠিয়া আসিতেছে। মনের মেলায় চিন্তার এই নাগরদোলার আর বিরাম নাই। সকল সময়ে একটা কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়াই যে বিস্মৃত চিন্তা মনের চোরা কুঠুরি হইতে চেতনার প্রকাশ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, এমন নহে। অনেক সময়ে অকারণে অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। উদাস সন্ধ্যায় ধূসর আকাশের পানে চাহিয়া হঠাৎ মনে পড়ে প্রিয়জনের কথা। বিরহী মন কাঁদিয়া উঠে। নিশীথ রাতে বাঁশীর করুণ সুর শুনিয়া সহসা মনে পড়িয়া যায় গতজীবনের বিষাদমাখা স্মৃতি। অতীতের অস্পষ্ট গর্ভ হইতে জাগিয়া উঠে বেদনার সকরুণ ছবিগুলি। কেন যে এমন হয় ইহার উত্তর দেওয়া সুকঠিন। হেমন্তের সন্ধ্যায় মাঠের পথে চলিতে চলিতে মনে পড়িয়া যায় বাল্যবন্ধুর কথা যাহার সঙ্গে জীবনের বহুস্মৃতি জড়াইয়া আছে। শ্রাবণ রাত্রি; আকাশে জল ঝরিতেছে; বাতাস হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে; সহসা মন কাঁদে প্রিয়জনের জন্য। যাহাকে বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়াছি তাহাকে বুকের কাছে পাইবার জন্য হৃদয় অস্থির হয়। দূরের বিস্মৃত মানুষ কেন যে বর্ষার মেঘকজ্জল দিবসে, আষাঢ়ের বর্ষণমুখর রাত্রে প্রাণের অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদিগকে কাঁদায়, কে বলিবে? মেঘের নীলিমা দেখিয়া রাধা কাঁদিত। সেখানে মেঘের সজল ঘনিমার পানে চাহিয়া

রাধার মনে পড়িত কৃষ্ণের চন্দনচর্চ্চিত নীল কলেবরের কথা। মেঘের সেতু বাহিয়া কৃষ্ণ আসিত রাধার মনের মধ্যে। কিন্তু বর্ষণমুখর বাদলরাত্রে কেন শূন্য হৃদয়মন্দির বাঞ্ছিতের জন্য হাহাকার করিতে থাকে ? ইহার উত্তর কে দিবে ?

* * *

২

Dissociation ঃ কিন্তু কতকগুলি স্মৃতি ও চিন্তাকে সহস্র চেষ্টাতেও আমরা চেতনার আলোকে আনিতে পারি না। তাহারা বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই অতল অন্ধকার হইতে কোন ডুবুরীই তাহাদিগকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলিতে পারে না। সাইকোএ্যানালিসিসে ইহাদিগকে dissociated thoughts বলে। মনস্তত্ত্ব-বিদগণের মতে—

Dissociated thoughts or memories cannot be brought into consciousness.

ম্যাগডুগাল সাহেব তাঁহার Abnormal Psychology নামক গ্রন্থের মধ্যে মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত কতকগুলি রোগীর ইতিহাস দিয়াছেন। ইহারা বিগত যুদ্ধের সৈনিক। একটী ক্যানাডাবাসী কৃষক সৈনিক হইয়া

যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল। একটী সাংঘাতিক যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনের রাজ্যে একেবারে ওলট-পালট ঘটিয়া গেল। ঐ যুদ্ধে তাহার প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যু ঘটে। মৃত বন্ধুটির ক্ষতবিক্ষত দেহের বীভৎস দৃশ্য তাহার মনকে এমন নাড়া দিল যে সেই আঘাতে তাহার মন একেবারে রিকল হইয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল চাষবাসের কথা, ক্যানাডার জীবন-যাত্রার কথা। গাধার ছবিকে বলিতে লাগিল ঘোড়ার ছবি, শেয়ালকে বলিল কুকুর, লাঙলের বর্ণনা দিতে পারিল না। তাহার সত্ত্বার এক অংশ যেন অতীতের গর্ভে চিরতরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের এক অংশ যেন ছিঁড়িয়া গিয়া কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এমনি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অতীতে সে যাহা করিয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে তাহার কোন কথাই তাহার মনে নাই। অতীতের মানুষ আর বর্ত্তমানের মানুষটী যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহাদের কোথাও যোগ নাই। রোগী কিছুতেই তাহার অতীত জীবনের কথা মনে করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার সাহায্যে পূর্ব্বের স্মৃতি আবার ফিরিয়া আসে, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। ক্যানাডার সৈনিকটী তাহার পূর্ব্বস্মৃতি

ফিরিয়া পাইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্মৃতি আর চেতনার ক্ষেত্রে জাগে না। অপ্রীতিকর চিন্তাকে চেতনার ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইতে অনেক সময়ে এই স্মৃতি-লোপ ঘটিয়া থাকে। রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য ও চিন্তাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে গিয়াই বহু সৈনিক এই মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। গৃহে বহু বিপদের মধ্যে অসহায় স্ত্রী-পুত্রকে ফেলিয়া আসা সহজ ব্যাপার নহে। চক্ষের সম্মুখে মানুষের মাথা উড়িয়া যাইতেছে, নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িতেছে—সেও কি দুঃসহ দৃশ্য! এই সব অপ্রীতিকর স্মৃতিকে জোর করিয়া দাবাইয়া রাখার চেষ্টা অনেক সৈনিকের মনকে বিকল করিয়া দিয়াছে। সাইকো-এ্যানালিসিসে ইহাকে বলে Dissociation.

৩

So fragmentary is consciousness that most of the self is, at any one time, hidden from view. Consciousness plays over its surface but is not identical with it. Of all the possible things that we could think, remember or perceive only a minute fraction can enter consciousness at one time. (Outline of Modern Knowledge).

"আমরা যাহাকে চেতনা বলিয়া থাকি তাহা আমাদের সত্ত্বার অংশমাত্র, অতিক্ষুদ্র অংশমাত্র। যে কোন একটী সময়ে আমাদের সত্ত্বার প্রায় সবটুকু অংশ দৃষ্টির আড়ালে থাকে। চেতনা সত্ত্বার উপরিভাগে খেলিয়া বেড়ায়—ইহা এবং সত্ত্বা এক নহে। আমাদের পক্ষে যত কিছু চিন্তা করা, স্মরণ করা অথবা দর্শন করা সম্ভবপর তাহাদের অতি অল্প অংশ কোন একটী সময়ে আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে।"

তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল, আমার মনে যে অংশ চেতনার আলোকে আলোকিত হইয়া আছে তাহাই আমার সত্ত্বার সবটুকু নয়। সেই অংশ আমার সমগ্র সত্ত্বার অতি-ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ। যখনই আমি অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখনই দেখিতে পাই চেতনা আমার সত্ত্বার উপরিভাগে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—উহা খণ্ড-আমি মাত্র। আমার অবশিষ্ট সত্ত্বা সকল সময়েই দৃষ্টির বাহিরে লুকাইয়া থাকে। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় অনেক সময়ে ভাসিয়া যায়। এইরূপ একটা বরফের পাহাড়ে ঠেকিয়াই 'টাইটানিক' জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল। পাহাড়ের খানিকটা অংশ জলের উপরে জাগিয়া থাকে—বাকী অনেকখানি থাকে সমুদ্রের ভিতরে দৃষ্টির বাহিরে। আমার মনের যে অংশ চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে তাহা সমুদ্রের উপরে ভাসমান বরফখণ্ডের মত—তাহা আমার সবটুকু নয়। আমার মনের প্রায় সবটুকুই গুপ্ত হইয়া আছে

আমার চেতনার বহির্ভাগে। উহাকে আমি জানিতে পারিতেছি না, দেখিতে পারিতেছি না। উহা সমুদ্রের তলদেশে লুক্কায়িত বরফের পাহাড়ের মত।

৪

অবদমন বা Repression—আমাদের মনের যে কুঠুরিটা চেতনার আলোকে দীপ্ত তাহার সহিত জমিদারের খাসকামরার তুলনা হইতে পারে। যে কুঠুরিটা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তাহাকে মনে করিতে পারি জমিদারের কাছারির বহির্বাটীর মত। খাসকামরায় সকলের প্রবেশের অধিকার নাই। প্রজারা বহির্বাটীতে বসিয়া থাকে। পেয়াদা সকলকে জমিদারের সঙ্গে দেখাশুনা করিতে দেয় না। যাহাকে যে খাসকামরায় প্রবেশের অধিকার দেয় সে-ই সেখানে প্রবেশ করিতে পায়। সকলেই জমিদার বাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য ঠেলাঠেলি এবং হুড়াহুড়ি করে কিন্তু খাসকামরা ও বহির্বাটীর মধ্যে যে দুয়ার আছে সে-ই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে পেয়াদা। যাহাকে প্রয়োজন তাহাকে ব্যতীত আর সকলকে সে ধাক্কা দিয়া বহির্বাটীতে খেদাইয়া দিতেছে।

আমাদের মনের গোপনকক্ষে, অন্তরের অতল প্রদেশে যে সকল ইচ্ছা বিদ্যমান আছে তাহারা সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে চেতনার রাজ্যে আসিবার জন্য। কিন্তু অন্তরের সকল চিন্তাকে, সকল ইচ্ছাকে চেতনার ক্ষেত্রে আমরা স্থান দিতে পারি না। কোন্ চিন্তা ভালো এবং কোন্ চিন্তা মন্দ তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা বোধ আছে। যে ইচ্ছাকে আমি মন্দ ইচ্ছা বলিয়া বোধ করি, যে ইচ্ছাকে মনে স্থান দিলে আমি নিজের কাছে ছোট হইয়া যাই সেই ইচ্ছাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সেই অশুভচিন্তা যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে তখন তাহাকে তাড়াইবার জন্য আমিও প্রাণপণ চেষ্টা করি। মনের মধ্যে ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার, প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির সর্ব্বদাই সংগ্রাম চলিতেছে। 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।' আমি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি—স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসা আমার পক্ষে অধর্ম্ম। কিন্তু অন্তরে আমার মধ্যে যে আদিম পুরুষ রহিয়াছে সে নারীর অধরসুধা পান করিবার জন্য পিপাসু হইয়া আছে। তাহাকে কত বুঝাইতেছি, কত শাসাইতেছি—কিন্তু কোন ধর্ম্মকথাই সে শুনিতে চাহে না, কোন শাসনই সে মানিবে না। সে চায় রমণীর প্রেম,

সে চায় নারীদেহের সৌন্দর্য্য। আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের বাঁধ ভাঙিয়া সেই আদিম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু আমি ত তাহাকে স্বীকার করিতে পারি না। আমার মধ্যে যে বৈরাগী-মানুষ একতারা বাজাইতেছে সে বলিতেছে, নারীর সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী; নারীর প্রেমে শান্তি নাই। দেহের জন্য দেহের যে বাসনা—সেই উন্মত্ত বাসনা অগ্নিশিখার মতই জ্বালাময়ী; তাহা আমাদিগকে দগ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে না। লোকলজ্জা আমাকে বলিতেছে, ছিঃ ছিঃ! সামান্য ইন্দ্রিয়-স্রোতে যদি ভাসিয়া যাও তবে সমাজে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? লোকের নিকট চিরকাল কলঙ্কী হইয়া রহিবে। তোমাকে দেখিয়া রাস্তার লোকে হাসিবে, আত্মীয়স্বজন বিদ্রূপ করিবে। এমনি করিয়া একদিকে আমার মধ্যে আদিম পুরুষের উদ্দাম কামনা এবং আর একদিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগের আদর্শ, অনাসক্তির আদর্শ—এই উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের ছবিই আনাতোল ফ্রাঁস্ (Anatole France) তাঁহার 'Thais' নামক বিখ্যাত উপন্যাসে অঙ্কিত করিয়াছেন। আনন্দমঠে সন্ন্যাসী ভবানন্দ কল্যাণীর জন্য জীবনে যে দ্বন্দ্বকে ডাকিয়া আনিয়াছে সেও মানুষের হৃদয়ে ভালোমন্দের এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। নরনারীর অন্তরে এই আদিম যৌনপ্রবৃত্তি সাগরের মত তরঙ্গিত হইতেছে। এই সাগরের আক্রমণকে প্রতিহত

করিবার জন্য মানুষ নীতির কত বাঁধই না বাঁধিয়াছে। কিন্তু সহসা সাগরে দোলা লাগে; বাঁধ ভাঙিয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি সমস্ত একাকার করিয়া দেয়। কোন্ নিষ্ঠুর দেবতা আমাদিগকে পাগল করিয়া বিনাশের পথে ঠেলিয়া দেয়—তাহা আমরা জানিনা। শুধু জানি, অতিকঠোর সন্ন্যাসীরও আজন্মের সাধনা কখনো কখনো এই তরঙ্গবেগ সহ্য করিতে পারে না; উর্ব্বশীর চটুল নয়ন উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীর মনকেও প্রলুব্ধ করে; উমার সৌন্দর্য্যরাশি সর্ব্বত্যাগী শঙ্করের তপস্যাও ভাঙ্গিয়া দেয়।

যে ইচ্ছাকে আমরা মনের মধ্যে স্থান দিতে চাহি না সেই ইচ্ছাকে আমরা দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাই। 'Thais' উপন্যাসের সন্ন্যাসী যে-রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিল তাহার চিন্তাকে মন হইতে দূরে রাখিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর চিন্তাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য চিত্তদমনের কতই না চেষ্টা করিয়াছে—আপনার অপরাধী চিত্তকে কতই না চোখ রাঙাইয়াছে। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে বলিতেছে—

যথার্থ আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে ভাবিয়াছ—আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নাই; এমন ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা, আমার চিত্ত বশ হইল না।'

সন্ন্যাসীর এবং নগেন্দ্রের চিত্তদমনের এই প্রাণপণ প্রয়াস—অনভিপ্রেত চিন্তাকে মনের দোরগোড়া হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার এই চেষ্টা—ইহাই Repression অথবা অবদমন বলিয়া অভিহিত হয়।

"It would appear, in fact, that one of the results of mental conflict is that certain thoughts and tendencies may be forced into the unconscious. This process of active exclusion from consciousness is called repression." (*Outline of Modern Knowledge*).

প্রেসিডেন্সী কলেজে একটী অধ্যাপকের পদ খালি হইয়াছে। আমি এবং আমার এক বন্ধু উভয়েই সেই পদের জন্য আবেদন করিয়াছি। আমার দাবী বেশী থাকিলেও আমি পদটী পাইলাম না। বন্ধুটী পাইল। আমি খুসী হইতে পারিলাম না। পরশ্রীকাতরতা আমার মনকে অধিকার করিল। কিন্তু এই পরশ্রীকাতরতা যে ঘৃণ্য তাহা আমি বুঝিতে পারি। আমি ক্ষুদ্র ঈর্ষাকে মন হইতে সরাইয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বন্ধুর সাফল্যে মনকে খুসী করিবার জন্য ভিতরে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। বন্ধুর প্রতি এই ঈর্ষাকে অপসারিত করিবার চেষ্টা—ইহা অবদমন বা Repression ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমি বিগত মহাযুদ্ধের একজন ফরাসী সৈনিক। জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চ আক্রমণ করিবার জন্য আমি সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলাম। সামনে ছিল খোলা মাঠ। সেই খোলা মাঠের পরে কাঁটার তারের বেড়া। জার্ম্মাণ মেশিন-গানগুলি হইতে শ্রাবণের বারিধারার মত গুলিবর্ষণ হইতেছিল। সেই গুলিবৃষ্টির মধ্যে রাইফেল হস্তে শত্রুর ট্রেঞ্চ আক্রমণ করিতে আমার হৃৎপিণ্ড ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ভিতরের তেজস্বী সৈনিকপুরুষ বলিয়া উঠিল, 'ছিঃ, ভীরুতা সৈনিকের পক্ষে কলঙ্ক। সিপাহীর ধর্ম্ম সম্মুখ যুদ্ধে হাসিমুখে প্রাণ দেওয়া। হাতের মুঠার মধ্যে আপনার জীবনকে সে সহজে বহন করিয়া লইয়া চলিবে; তাহার চিত্ত হইবে ভাবনাহীন, জীবন ও মৃত্যু হইবে পায়ের ভৃত্য।' মন হইতে ভয়কে বিদূরিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রাইফেল দৃঢ়হস্তে চাপিয়া ধরিয়া গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিলাম জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চের দিকে। মন হইতে ভয়কে বিদূরিত করিবার এই যে প্রয়াস—ইহাও Repression বা অবদমন। ফ্রয়েডের ভাষায়ঃ

Repression, as you will remember, is the process by which a mental act capable of becoming conscious (that is one which belongs to the preconscious system)

is made unconscious and forced back into the unconscious system.

(*Introductory Lectures P. 257*)

৫

Repression এবং **Dissociation**—মনের এই দুইটী প্রক্রিয়াকে কোন কোন গ্রন্থকার একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। অবদমনের ব্যাপারে দেখা যায়, যে ঘটনার স্মৃতিকে চেতনার বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, রোগী সেই ঘটনার উল্লেখ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিতে চায়। অপ্রিয় ঘটনার স্মৃতিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া চাপিয়া রাখিলে রোগী সেই ঘটনাকে সহজে আর স্মরণপথে আনিতে পারে না। অবদমনের ব্যাপারে আর একটী বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনের ভিতরে পরস্পর-বিরোধী আদর্শ এবং প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে সংগ্রাম যখন অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠে তখন সেই সংঘর্ষের দুঃসহ বেদনা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমরা অবদমনের আশ্রয় লই। অন্তরের মধ্যে এই যে আদর্শে আদর্শে সংগ্রাম চলিতে থাকে—ইহার ছাপ রোগীর আচারে ব্যবহারে ফুটিয়া উঠে; রোগী তাহার বেদনার চিহ্ন ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

Dissociationএর ব্যাপার অবদমন হইতে স্বতন্ত্র। অবদমনের ব্যাপারে রোগী অপ্রিয় ঘটনার প্রসঙ্গ সর্ব্বপ্রযত্নে এড়াইয়া চলিতে চাহে। অনেক সময়ে বিস্মৃত ঘটনাকে স্মরণপথে আনয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। Dissociation-এর বেলায় রোগী বিস্মৃত ঘটনাকে স্মৃতিপথে আনিতেই পারে না। ঘটনার স্মৃতি রোগীর চিত্তপট হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায়। অবদমনের ব্যাপারে অপ্রিয় বা অনভিপ্রেত স্মৃতিকে দাবাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টা রোগীর জীবনে বেদনার একটা ছায়া ফেলিয়া থাকে। অন্তরে যে সংগ্রাম চলিতে থাকে সেই সংগ্রামের চিহ্ন রোগীর মুখে চোখে আচারে ব্যবহারে ফুটিয়া উঠে। Dissociationএর ব্যাপারে অন্তরলোকের দ্বন্দ্বের কোন আভাসই দেখিতে পাওয়া যায় না—সেখানে বেদনা বলিয়া কিছু নাই। আছে একটা অস্বাভাবিক ঔদাসীন্যের ভাব।

৬

Censor বা **প্রহরী**—যে পেয়াদা অনভিপ্রেত ইচ্ছা-গুলিকে দূরে ঠেলিয়া দেয়, চেতনার ক্ষেত্রে অথবা চিত্তের খাস-কামরায় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না তাহার নাম Censor অথবা প্রহরী। আমরা ইহাকে বিবেকও বলিতে

পারি। জমিদারের কাছারিবাটী ও খাসকামরার মত যে দুইটী প্রকোষ্ঠ আমাদের মনের মধ্যে বিদ্যমান, তাহাদের একটীর নাম Conscious এবং অপরটীর নাম Sub-conscious. সেই প্রকোষ্ঠ দুইটীর মধ্যবর্ত্তী দ্বারদেশে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে Censor. প্রহরীর অনুমোদন ব্যতীত কোন ইচ্ছা চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাদেবের তপস্যাক্ষেত্রের প্রান্তে সে নন্দীর মত বেত্র উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কোন চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার উপক্রম করিতেছে দেখিলেই দ্বারী জিজ্ঞাসা করে Who comes there ? যদি ইচ্ছাটী আমাদের নীতিধর্ম্মের অনুমোদিত হয় প্রহরী তাহাকে চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার অনুমতি দান করে। যদি ইচ্ছাটী আমাদের নীতিধর্ম্মের অনুমোদিত না হয় তবে প্রহরীর কাছে উহা friend নহে, foe—বন্ধু নহে, শত্রু। প্রহরী ধাক্কা দিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেয়। নিষিদ্ধ বিতাড়িত ইচ্ছাগুলি খোলাখুলিভাবে উলঙ্গ মূর্ত্তি লইয়া স্বপ্নেও চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না ; কারণ প্রহরীকে বিশ্বাস নাই—ঝিমাইতে ঝিমাইতেও সে ধরিয়া ফেলিতে পারে। তাই স্বপ্নে Unconscious যখন চেতনার প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করে তখন ছদ্মবেশের আশ্রয় লইয়া তাহাকে আসিতে হয়। ছদ্মবেশধারী

Unconscious স্বপ্নলোকে প্রহরীকে বোকা বানাইয়া দেয়, তাহার সকল গর্ব্ব হরণ করে। Unconscious এবং Censorএর এই দ্বন্দ্ব পেচক এবং কাকের দ্বন্দ্বের মত। দিবাভাগে পেচক অসহায় এবং অক্ষম। কাকের সঙ্গে সে একেবারেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না; কাক তাহাকে ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া মারিয়া ফেলে। দিবাভাগে আমাদের জাগ্রত মুহূর্ত্তগুলিতে Censor কাকের মতই প্রতাপশালী। কিন্তু রাত্রে কাক দিবসের পেচকের মতই অন্ধ হইয়া যায়। সে কিছুই দেখিতে পায় না। পেচকের হস্তে তখন বেচারার দুর্গতির একশেষ হয়। দিবসে কাকের জয়, পেচকের পরাজয়। রাত্রিকালে কাকের পরাজয়, পেচকের জয়। পেচকের সঙ্গে আমরা Unconsciousএর তুলনা করিতে পারি। দিবাভাগে আমরা যখন জাগিয়া থাকি তখন প্রহরীর জয়, Unconsciousএর পরাজয়। রাত্রিকালে আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি তখন Censor অথবা প্রহরীর পরাজয় এবং Unconsciousএর জয়। আমাদের জীবন একটা মল্লভূমি ছাড়া আর কিছুই নহে। সেই মল্লভূমিতে অপার সংগ্রাম চলিতেছে Unconscious এবং Censorএর মধ্যে। গজকচ্ছপের এই যে লড়াই—ইহার আর শেষ নাই। Censor এবং Unconscious—এই উভয় মল্লবীরের মধ্যে যে জয়লাভ করে Consciousnessএর কাজ

হইতেছে তাহাকে চেতনার রাজ্যে গ্রহণ করা। লড়াইয়ের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। যাহার মধ্যে পশুটা দিন দিন মরিয়া যাইতেছে এবং দেবতার সিংহাসন দিন দিন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান। He is blessed who is assured that the animal is dying out in him day by day and the divine being established.

৭

ছদ্মবেশী কাম—প্রহরী যে সকল ইচ্ছাকে চেতনার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করে তাহাদের সবগুলিই যে সেই আজ্ঞা নতশিরে মানিয়া লইয়া প্রস্থান করে এমন নহে। অনেক ইচ্ছা আমাদিগকে জড়াইয়া থাকে যাহাদিগকে আমরা নীতির পথে বাধা বলিয়া জানি। তবুও কিন্তু তাহাদিগকে প্রাণপণে আদর করিতে ইচ্ছা করে। প্রহরী তাহাদিগকে চেতনার ক্ষেত্রে কখনই আসিতে দিবে না, কিন্তু তাহারা যে আমার মর্ম্মের মূলে বাসা লইয়াছে। তাহাদিগকে নির্ব্বাসন দিতে আমার মন যে কিছুতেই চাহে না। উপায় কি?

উপায় ছদ্মবেশ। যে সকল প্রবৃত্তিকে নীতিধর্ম্ম-বিগর্হিত

বলিয়া প্রহরী চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না অথচ যাহারা আমার একান্তই প্রিয় তাহাদিগকে ছদ্মবেশ পরাইয়া তবে চেতনার ক্ষেত্রে আনিতে হয়। নিজের সঙ্গে এমনি করিয়া আমরা কতই না লুকোচুরি খেলিয়া থাকি। আমরা ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাই, ভাবের ঘরে চুরি করি। রোমা রলাঁ্যার একখানি উপন্যাসের নাম Soul Enchanted. এই উপন্যাসের নায়িকা আনেত্ (Annette) তরুণ চিত্রকর Franzকে ভালবাসিয়াছে। নায়িকা চিত্রকরের মাতার বয়সী—তাহার অপেক্ষা কুড়ি বৎসরের বড়। নায়িকার নিজেরও একটী পুত্র আছে। আনেতের কেশে পাক ধরিয়াছে—কিন্তু দেহে বার্দ্ধক্য আসিলে মনেও যে বার্দ্ধক্য আসিবে—তাহার কি মানে আছে? নায়িকার মন তরুণীর মনের মত—প্রেমে ভরপুর। Franz যে তাহাকে ভালবাসিয়াছে—এই সত্য তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; অন্যের মনকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কিন্তু কখন যে চোরের মত নিঃশব্দে আসিয়া প্রেম তাহার নিজেরই অন্তরে বাসা লইয়াছে ইহা সে প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই। —নারী বলিয়াই বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল —Franzকে সে নিজের ছেলের মতই ভালবাসে—সেই ভালবাসা নিষ্কাম। কিন্তু আসলে ত ভালবাসা নিষ্কাম ছিল না। আমি চিত্রকরকে ছেলের মত ভালবাসি—আপনাকে

ভুলাইবার জন্য আনেত্ এই বাৎসল্যভাবের আশ্রয় লইয়াছিল—নিজেকে প্রতারিত করিবার জন্য ইহা ছিল তাহার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ছলনা। এই ছলনার প্রয়োজন ছিল। যে পুত্রের বয়সী তাহাকে সোজাসুজি প্রেমিকার মত ভালবাসিতে নায়িকার সংস্কারে বাধে। যাহার সঙ্গে বয়সের এত ব্যবধান তাহাকে সোজাসুজি প্রেমিকের আসন দান করিতে সংস্কারে যখন বাধে তখন উপায় কি ? প্রহরী মনের দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, 'হুসিয়ার ! চিত্রকরের চিন্তাকে মনে স্থান দিতে পারিবে না। তাহাকে ভালবাসা অন্যায়, নীতিধর্ম্মবিগর্হিত।' নারীর মন কাঁদিয়া বলিতেছে—'সে না থাকিলে জীবন-দেউল শূন্য হইয়া যায়। সে যে প্রাণের প্রাণ !' নিরুপায় হইয়া নায়িকা নিষ্করুণ প্রহরীকে ফাঁকি দিল। সে প্রহরীকে বলিল, 'আমি উহাকে ছেলের মত ভালবাসি। এই ভালবাসার মধ্যে কামগন্ধ নাই।' প্রহরী চিত্রকরের চিন্তাকে নারীর চেতনার ক্ষেত্রে তখন আসিতে দিল। রমণী আপনাকে ফাঁকি দিল, প্রহরীকে ফাঁকি দিল, কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দিতে পারিল না—অন্তর্য্যামী অলক্ষ্যে হাসিলেন। সময় আসিলে অন্তর্য্যামী পুরুষ আনেত্‌কে বুঝাইয়া দিলেন, মায়ের ভালবাসার মুখোস-পরা প্রবৃত্তির মধ্যে লুকাইয়া ছিল কামনা—পুরুষের জন্য নারীচিত্তের চিরন্তন দুর্ব্বার কামনা। অবশেষে আনেত্‌কে চোখের

জলে স্বীকার করিতে হইয়াছে—I saw I was disinterested! And self-interest like a thief stole into the house!

Thais উপন্যাসের নায়ক প্যাফ্নুটিয়াস্ প্রকৃতপক্ষে পরমা সুন্দরী অভিনেত্রী Thaisকে ভালবাসিত। Thais-এর প্রেম তাহাকে ভিতরে ভিতরে প্রবলভাবে টানিতেছিল। কিন্তু সংন্যাসী মানুষের পক্ষে নারীকে ভালবাসা পাপ। Paphnutiusএর বিবেক কিছুতেই এই ভালবাসাকে সমর্থন করিতে পারে না। এ দিকে Thaisএর আকর্ষণ দিন দিন দুর্ব্বার হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর প্রাণের তারে শুধু বাজিতে লাগিল 'Thais', Thais'.

অবশেষে নারীর আকর্ষণ জয়লাভ করিল; সদর দরজা দিয়া সোজাসুজিভাবে নহে, কারণ সেখানে কঠোর প্রহরী (Censor) দাঁড়াইয়া বলিতেছে, 'সন্ন্যাসীর হৃদয়ে নারীর স্থান নাই।' নারীর আকর্ষণ জয়ী হইল করুণা ও পরোপকারের ছদ্মবেশ পরিয়া। সন্ন্যাসী আপনাকে এই বলিয়া ভুলাইল, 'হায়, Thais আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। তাহাকে পাপের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা আমার কর্ত্তব্য।'

সন্ন্যাসীর সাথী Palemon তাঁহাকে বুঝাইলেন, 'যাইও না; মরুভূমিতে আপনার তপস্যা লইয়া থাকো।' কিন্তু

সন্ন্যাসীর রক্তে তখন বাজিতেছে 'Thais', 'Thais'. সে যে দিকে চাহিতেছে সেই দিকে দেখিতেছে প্রিয়ার মুখচন্দ্র। সাথীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া সন্ন্যাসী ছুটিলেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে Thaisএর উদ্ধার হইল কিন্তু সন্ন্যাসী রমণীর প্রেম-সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যা গেল, শান্তি গেল, সাধনা গেল, রহিল শুধু থাইসের জন্য অশান্ত ক্রন্দন, বুকের মধ্যে নিষ্ঠুর প্রেমের চিতানল। এখানে কামনা আসিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয়কে অধিকার করিল করুণা ও পরোপকারের ছদ্মবেশে।

এমনি করিয়াই তুষারশুভ্র নিষ্কলঙ্ক ভালোবাসার মুখোস পরিয়া কামনা আসিয়া আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'এর বধূটী সাহিত্যালোচনার মধ্যে কখন যে দেবরকে তাহার নিঃসঙ্গ ক্ষুধার্ত্ত হৃদয়ের সব-টুকু মধু দান করিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে নিজেই জানেনা। স্নেহ কখন প্রেমের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে স্বামী-স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয় সেই সময় ভূপতি সম্পাদকীয় নেশা এবং রাজনৈতিক নেশায় বিভোর হইয়া রহিল। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা চারুলতার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। এমনি সময় ভূপতির পিসতুতো ভাই অমল

আসিয়া বৌদিদি চারুলতার জীবনরঙ্গভূমিতে দেখা দিল; বৌদিদির উপর অমলের ছোটখাট স্নেহের দাবীর অন্ত ছিল না। কোন একটা লোকের কোনো কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা চারুলতার পক্ষে তখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে কাব্য-আলোচনার মধ্য দিয়া উভয়ের সম্পর্ক নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিতে লাগিল। অমল কাব্য লেখে—লিখিয়া চারুকে শোনায়; বৌদিদি মুগ্ধ চিত্তে দেবরের মুখ হইতে সেই লেখা শুনিয়া যায়। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভাণ্ডার লুট করিয়া আনে। এই নৈকট্য, এই স্নেহের শত আবদারকে আশ্রয় করিয়া প্রেম ইতিমধ্যে চারুর অন্তরে গোপনে আশ্রয় লইয়াছে। ভূপতি আসিয়া যখন চারুকে বলিল—অমলের একটী ভালো বিবাহের প্রস্তাব এসেছে তখন অন্যমনস্কভাবে চারু বলিয়া ফেলিল, 'কেন আমাকে কি পছন্দ হোলো না?' অতর্কিত মুহূর্ত্তের এই একটি মাত্র কথায় চারু অমলের প্রতি আপনার গোপন অনুরাগকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অমল যখন বিলাত চলিয়া গেল একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান চারুর গর্ব্বের বিষয় হইয়া উঠিল—উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া চারু বারবার করিয়া বলিত—অমল, অমল, অমল! আপনার স্ত্রী যে হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে—একথা বেচারা ভূপতি যখন জানিতে পারিল

তখন আর নষ্টনীড় পুনরায় গড়িবার উপায় ছিল না। এমনি করিয়াই বিশেষ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সমবয়সী দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধটুকু আছে তাহাও কখন কখন বাসনার স্পর্শে মলিন হইয়া যায়—যেখানে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না সেখানে ভয়ের কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। দেওর-ভাজ সম্বন্ধের মনোরম মুখোসখানা পরিয়া দেবরের প্রতি অবৈধ অনুরাগ যে চারুর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ধীরে ধীরে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—একথা চারু জানিয়াও জানিল না। ভূপতির দাম্পত্য-জীবনের নীড় যে ভাঙ্গিয়া গেল তাহার মূলে শুধু তাহার নিজের মূঢ়তা নহে, চারুলতার আত্মপ্রবঞ্চনাও ইহার জন্য অনেকখানি দায়ী। আমাদের জীবনের বহু দুঃখের মূলে এই আত্মপ্রবঞ্চনা।

পরস্পরকে আদর করিবার বেলায় অবিবাহিত তরুণ তরুণীর মনে রাখা উচিত, আগুন লইয়া তাহারা খেলা করিতেছে। এই সর্ব্বনেশে খেলা খেলিতে গিয়া কত পুরুষ, কত নারী যে আপনাদের শিরে কলঙ্ক ডাকিয়া আনিল! যাহারা আপনাদের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া যে অধঃপতনের পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছে—এরূপ মনে করা ভুল। নারী ও পুরুষ দেহের দিক দিয়া পরস্পর পরস্পরের নৈকট্য

খুঁজিয়াছে। যে যাহাকে ভালোবাসে সে তো তাহার সঙ্গ কামনা করিবেই। একজন আর এক জনের হাতে হাত রাখিয়াছে, মুখে মুখ দিয়াছে, বুক দিয়া প্রিয়জনের বুক স্পর্শ করিয়াছে। তাহার পর হঠাৎ কোন্ এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে প্রবৃত্তির বন্যা অত্যন্ত বেগবতী হইয়া সংযমের সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া দিয়াছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো যৌন-ইচ্ছার বেগ সমস্ত শাসনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া রক্তবর্ণ শিখায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ-জ্বলিয়া-ওঠা কামনার সেই দুরন্ত শিখায় পুড়িয়া গিয়াছে লোক-লজ্জা, শুভবুদ্ধি সব-কিছু। নারী হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার কুমারী-জীবনের নির্ম্মলতা, পুরুষও হারাইয়াছে তাহার নিষ্কলঙ্ক কৌমার্য্যের গৌরবকে। প্রিয়জনের আদর কুড়াইতে গিয়া নিজেকে এবং প্রেমাস্পদকে বিপন্ন করা কোনো কাজের কথা নয়।

দ্বিতীয় কথা—পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে যখন খুব নিকটে পায় তখন তাহাদের প্রবৃত্তির দিকটা নাড়া খাইয়া ভিতর হইতে জাগিয়া উঠে। দৈহিক উত্তেজনার আতিশয্যে একজন আর একজনকে ভালো করিয়া জানিবার সুযোগ পায় না। কামনার ধূলায় দৃষ্টি অন্ধ হইয়া যায় আর সেই অন্ধ দৃষ্টি লইয়া একজন আর একজনের গলায় বরণমাল্য দান করে। অবশেষে মিলনের পরিণতি ঘটে ব্যর্থতায়। জীবনের সাথী হইবে যে তাহার শুধু প্রবৃত্তিকে

চরিতার্থ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না। দেহের ক্ষুধাকে যে-কেহ চরিতার্থ করিতে পারে। কিন্তু আজীবন যাহার সহিত একত্র বাস করিতে হইবে তাহার রূপের সঙ্গে গুণও থাকা চাই, তাহার সঙ্গে চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকা দরকার। নহিলে পরিণয় কখনো সুখের হইতে পারে না। কূজনে গুঞ্জনে, আদরে সোহাগে শরীরে রোমাঞ্চ জাগে কিন্তু দাম্পত্য জীবনকে সুখী করিবার জন্য প্রয়োজন একের মধ্যে অন্যের মিশিয়া যাওয়া। নরনারী যেখানে দেহের দিক দিয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে আসে সেখানে প্রবৃত্তির উত্তেজনা তাহাদের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং সেই নির্ব্বুদ্ধিতা বিবাহকে শেষ পর্য্যন্ত একটা প্রহসনে পরিণত করে।

আমরা অন্তরে অন্তরে জানি, যাহাকে ভগ্নী বলিয়া কাছে রাখিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাকে ঠিক ভগ্নীর মত দেখিনা, যাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেছি তাহার প্রতি ভালবাসা আপনার সহোদরের প্রতি ভালবাসার ঠিক অনুরূপ নহে। তবুও একথা বন্ধুর কাছে দূরে থাকুক, নিজের কাছেও সহজে স্বীকার করি না। স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হই, আমাদের সংস্কারে বাধে। পাছে বিবেকের দংশনে উৎপীড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িতে হয় তাই নিজেকে এই বলিয়া ভুলাই, আমি উহাকে

ভগ্নীর মত ভালবাসি, ভায়ের মত ভালবাসি, বন্ধুর মত ভালবাসি। আমি যদি এখন উহাকে ত্যাগ করি তবে সে মনে নিদারুণ ব্যথা পাইবে। বেচারাকে দেখিবার জন্য কেহ থাকিবে না। অথচ সে সব ক্ষেত্রে নিষ্করুণ হওয়ার মত করুণা আর নাই। যেখানে মিলনের কোন আশাই নাই, পরিণয় যেখানে অপরাধ সেখানে প্রিয়জনের নিকট হইতে সরিয়া আসা নিষ্ঠুরতা সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাকে আমি বন্ধুর মত ভালবাসি—এই ভাবে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়া প্রিয়জনকে আঁকড়াইয়া থাকা আরও নিষ্ঠুরতা। কারণ বিচ্ছেদের দিন যখন একান্তই আসিবে তখন ভালবাসার জনকে মিলনের আনন্দ যত বেশী করিয়া দিয়াছি বিচ্ছেদের বেদনাও তত বেশী করিয়া দিব। তাহা ছাড়া নির্ম্মল ভাল-বাসার মুখোস পরিয়া যাহারা হৃদয়ে বাসা লইয়াছে তাহারা কখন্ যে গভীর রাত্রে অতর্কিত মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবে—কে বলিবে? মনের ক্ষেত্রে ভালবাসা চিরদিন যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? মানুষের মধ্যে যে আদিম যৌন-প্রবৃত্তি রহিয়াছে—দুর্নিবার তাহার আকর্ষণ। যে কোন মুহূর্ত্তে ভালবাসা মনের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া দেহের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারে—the precarious balance may be upset at any moment

আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ত' কেবল দূর হইতে ভালবাসিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না—"প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।" ইচ্ছা করে প্রিয়জনকে একেবারে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখি—ক্ষণিকের বিচ্ছেদও দুঃসহ বলিয়া মনে হয়। প্রেমিকের এই মনোভাব বর্ণনা করিতে গিয়াই বৈষ্ণবকবি গাহিলেন,

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।"

দেহের জন্য দেহের এই কামনাকে আমরা নিন্দা করিতে পারি, অশ্লীলতা বলিয়া গালি দিতে পারি কিন্তু ইহা খুবই সত্য, ভালবাসা যতই নির্ম্মল হউক—দেহের ক্ষুধা তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। এই জন্যই কি রমণীরত্ন আয়েষা পুনঃ পুনঃ হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, জগৎসিংহের সহিত আর সাক্ষাৎ করিবেন না? আয়েষা জগৎসিংহকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রাণের ভালবাসা দেহের মিলনেচ্ছাকে হৃদয়ে স্থান দেয় নাই। পাছে পরস্পরের মধ্যে দেখাশুনা হইতে থাকিলে জগৎসিংহকে দেহের দিক দিয়া পাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে তাই, বোধ হয়, আয়েষা রাজপুত্রকে দেখা করিতে নিষেধ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'রমণী-হৃদয় যেরূপ দুর্দ্দমণীয় তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত।' আয়েষা রমণী।

তিনি জানিতেন, নারীত্বের সম্পূর্ণতা মাতৃত্বে। নারী সব ছাড়িতে পারে—ছাড়িতে পারে না শুধু মা হইবার আকাঙ্ক্ষাকে। সেই আকাঙ্ক্ষা তাহার রক্তের প্রত্যেক কণিকার সঙ্গে মিশাইয়া আছে। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি (Nature) তাহার প্রাণের তারে যে সুর বাজাইতেছে তাহা হইতেছে—তুমি সৃষ্টি কর—সন্তান সৃষ্টির মধ্যেই তোমার জীবনের চরম সার্থকতা। বিশ্বপ্রকৃতির এই সুরই তাহার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে নিশিদিন ধ্বনিত হইতেছে। বার্ণার্ড শয়ের ভাষায়,

Vitality in a woman is a blind fury of creation.

এই বিপুল সত্য আয়েষার সহজ অনুভূতিতে অতি সহজেই ধরা দিয়াছিল। তাই জগৎসিংহের প্রতি আপনার Platonic loveএ বিশ্বাস করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ক্ষুধাতুর চিত্তকে সংযত করিয়া তাই, বোধ হয়, তিনি জগৎসিংহের সংস্পর্শ হইতে আপনাকে এত দূরে দূরে রাখিয়াছিলেন। আয়েষা আপনার চিত্তকে বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে বিনোদিনী বিহারীকে অনুরোধ জানাইয়া বলিল, 'আজ রাত্রে তবে আমি এখানেই থাকি।' বিহারী তৎক্ষণাৎ অসম্মতি জানাইয়া উত্তর দিল, 'না, এত বিশ্বাস আমার নিজের উপরে নাই।' বিহারী মানব-স্বভাবের

সনাতন দুর্ব্বলতার কথা ভালো করিয়াই জানিত। তাই সে প্রলোভনকে প্রশ্রয় দিলোনা। সেই রাত্রেই একটার প্যাসেঞ্জার ট্রেণে বিনোদিনীকে বিহারী যাত্রীশূন্য মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে পুরুষদের গাড়ীতে আসিয়া বসিল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইরূপই করিয়া থাকেন। যাহারা নিজেকে বুঝিয়াও বুঝিবে না তাহাদের প্রেম দৈহিক নৈকট্যের সুবিধা লইয়া যদি পরিশেষে যৌন-মিলনে পর্য্যবসিত হয় তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। জল যখন নীচুর দিকে গড়াইয়া যায়, আগুন যখন পুড়াইয়া দেয় তখন ত' আমরা বিস্মিত হই না। Platonic loveএর দোহাই দিয়া নরনারী যখন আপনাদের প্রচ্ছন্ন যৌনক্ষুধাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে তখনই সেই অজ্ঞানতা দেখিয়া আমাদের মনে বিস্ময় লাগে। অথচ এই বিস্ময়ের বাস্তবিকই কোন কারণ নাই। মানব-চরিত্র যাঁহারা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, আমাদের সকলের মধ্যেই বন্দী হইয়া আছে একটা অশান্ত দানব, একটা গোপন সত্বা, একটা উন্মত্ত পারাবার। র‍ঁল্যার ভাষায় বলি,

There is a hidden soul, blind forces, demons which everyone of us bears imprisoned in himself.

আনাতোল ফ্রাঁসের একখানা বইতে বৃদ্ধ পুরোহিত বলিতেছে ঃ

Even now, though full of days and approaching my ninety eighth year, I am often led by the Enemy to sin against chastity, at least in thought.

আটানব্বুই বছরের দরজায় আসিয়াও প্রবৃত্তির দংশন হইতে বৃদ্ধের অব্যাহতি নাই। আরও একটা বিপদের কথা। নারীকে দেহের দিক দিয়া যত কম প্রশ্রয় দেওয়া যায় মনকে সে তত বেশী করিয়া জুড়িয়া বসে। The less they satisfy desire the more they inspire it.

মানব-সমাজের প্রথম সূত্রপাত হইতেই সমাজপতিগণ বিধানের পর বিধান গড়িয়াছেন, ধর্ম্মের অনুশাসনের পর অনুশাসনের বাঁধ বাঁধিয়াছেন, স্বর্গের লোভ দেখাইয়াছেন, নরকের ভীতি জাগাইয়াছেন। কেন? মানুষের ভিতরকার অশান্ত সমুদ্রকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য যাহাতে সাগরের প্রবল জলোচ্ছ্বাস মানুষকে সর্ব্বনাশের গহ্বরে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে না পারে। Our every effort, since the first existence of humanity has been directed towards the building up against this inward sea of the dykes of our reason and religions. কিন্তু মনের আকাশে কখন কামনার মেঘ উঁকি দেয়, যৌনক্ষুধার দুর্ব্বার ঝটিকায় শিরায় শিরায় রক্তস্রোত আলোড়িত হইয়া উঠে, ধর্ম্মের অনুশাসন, যুক্তির বাঁধ নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠে আদিম-

কালের ক্ষুধাতুর নর এবং ক্ষুধাতুরা নারী। নীতির সমস্ত বাঁধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুর্ব্বার আকর্ষণে নর ঝাঁপাইয়া পড়ে নারীর বুকে, নারী মুখ রাখে নরের মুখে। এই আকর্ষণ প্রেমের আকর্ষণ না ঘৃণার আকর্ষণ? জানিনা। কিন্তু এই আকর্ষণের সঙ্গে আর কোন আকর্ষণেরই তুলনা হইতে পারে না। আরও একটা মজার কথা—যে সকল আত্মা নানাদিক দিয়া ঐশ্বর্য্যশালী—ঝড় সেইগুলিকেই বেশী করিয়া আক্রমণ করে—and the richest souls are the most subject to storms. বড় গাছেই বেশী ঝড় লাগে—ইহা শুধু বাহিরের জগতে সত্য নহে, ভিতরের জগতেও ইহা সত্য।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা ভাল। আমরা যাহাকে Platonic love বলি সেই মনের ভালবাসার মধ্যে অনেক সময়ে দেহের ক্ষুধা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে সত্য কিন্তু প্রেমকে অন্তরে স্থান দিলে তাহা যে সব সময়েই দেহকে একান্তভাবে কামনা করিবে, ইহা সত্য নয়। দেহকে বর্জ্জন করিয়া প্রেম কোন কোন ক্ষেত্রে অম্লান গৌরবে শুধু আপনাকে আশ্রয় করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। Platonic love নিছক কবির কল্পনা নহে। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য অমিতকে ছাড়িয়া গেলেও প্রাণ হইতে তাহাকে বিদায় দেয় নাই। সেই ভালবাসার মধ্যে ছিল

না সুখের দাবী, ছিল না চাওয়ার দীন কান্না। তাহার মধ্যে ছিল বিপুল মুক্তির নির্ম্মল আনন্দধারা। লাবণ্য বলিল, "এই আগুনে-পোড়া-প্রেম, এ সুখের দাবী করে না, এ নিজে মুক্ত ব'লেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না, এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?" লাবণ্যের এই উক্তির মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই—দেহকে অতিক্রম করিয়াও প্রেম যে কেবল নিজেরই গৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে—লাবণ্যের মুখ দিয়া কবি ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। যাওয়ার বেলায় লাবণ্য অমিতকে বলিয়া গেল,

> "তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
> রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাহি বাকি,
> নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্ত্তের দৈন্যরাশি,
> নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব্বহাসি,
> নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি,
> ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

কবি বলেন, সেই প্রেম সম্ভব যাহার মধ্যে অভিমান নাই, আকাঙ্খা নাই, প্রার্থনা নাই, যাহা কেবল নিঃশেষে দান করিয়াই খুসী। মনস্তত্ত্ববিদ্ একটু মৃদু হাসিয়া বলেন, 'কবি, তোমার সমস্ত কথাই মানিয়া লইলাম—কিন্তু নর-নারীর কামগন্ধহীন প্রেম যদি আকাশ ছাড়িয়া মাটিতে

সহসা নামিয়া আসে তবে আমি উহাতে একটুও বিস্মিত হইব না। কামগন্ধহীন প্রেম মিথ্যা নয় মানি, কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আদিম জৈব প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহাও যে মিথ্যা নয়, ইহাও জানি।

এই জন্যই আমাদের মনকে ভাল করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে। প্রহরীর উপরে একান্তভাবে সবটুকু ছাড়িয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কারণ, নিজেই যেখানে নিজের সঙ্গে শত্রুতা করি সেখানে প্রহরী কি করিবে? বিতাড়িত ইচ্ছাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া প্রহরীকে ভুলাইয়া যখন চেতনার ক্ষেত্রে আসিতে দিই তখন সেই ফাঁকির পথ রুদ্ধ করিবে কে? এই ফাঁকির পথেই ত পাপ আসিয়া মনের মধ্যে বাসা গ্রহণ করে। সদর দরজায় প্রহরী পথ আগুলিয়া আছে—পাপ তাই আত্ম-প্রবঞ্চনার খিড়কীর দরজা দিয়া চোরের মত অন্দরে আসিয়া আশ্রয় লয়; তাহার পর এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে আমাদের দুর্ব্বলতার সুবিধা লইয়া সে অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি হরণ করে। মানুষের পতনের ইতিহাস আপনাকে এই ভুলাইবার ইতিহাস। কোন মানুষই জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমি চিরদিন পাপের ঊর্দ্ধে থাকিব, আমার কোন দিন অধঃপতন হইবে না, কালিমা কখনও আমাকে স্পর্শ করিবে না। পাপ এবং দুর্ব্বলতা সাপের মত—অজানা ছিদ্রপথে আসিয়া গোপনে

আমাদিগকে দংশন করে। এই সর্পদংশনের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার একমাত্র উপায় সর্ব্বদা সজাগ থাকা। রোমা র‍ঁল্যা তাই John Christopherএর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, No man is surely master of himself. A man must watch.

৮

স্বপ্ন ঃ—Censor যে সকল ইচ্ছাকে নীতিবিগর্হিত বলিয়া দূরে সরাইয়া দেয় তাহারা নিঃশেষে শূন্যতার অন্ধকারে মিলাইয়া যায় না। মনের চোরা কুঠুরিতে অথবা Sub-conscious regionএ গিয়া আশ্রয় লয়। রাতের বেলায় আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি প্রহরীর চক্ষুও তখন ঘুমে মুদিয়া আসে। সে ঝিমাইতে থাকে। চেতনার ক্ষেত্রে আসিবার এই তো উপযুক্ত সময়। প্রহরী ঝিমাইতেছে। দিনের বেলায় যাহার অতন্দ্র চক্ষু এড়াইয়া চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার কাহারও উপায় ছিল না রাতের বেলায় সে ঘুমাইতেছে! দিবসের বিতাড়িত ইচ্ছাগুলি মনের চোরাকুঠুরি হইতে বাহির হইয়া আসে এবং নিশ্চিন্তমনে চেতনার ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিড়াল যখন ঘুমায় ইন্দুর তখন

মহোল্লাসে নৃত্য করে; গৃহস্থ যখন নিদ্রামগ্ন তখনই ত' তস্করের গৃহপ্রবেশের সময়।

দিবসে প্রহরীর তাড়নায় যে সকল বাসনা অপূর্ণ থাকিয়া যায় রাত্রে স্বপ্নে সেই সকল সাধ আমরা মিটাইয়া থাকি। তখন বাধা দিবার কেহ থাকে না। এই সব স্বপ্ন এমন সব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের চেতনার আলোকে ভাসিয়া উঠে যে, ঘুম ভাঙিয়া গেলে লজ্জায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। এমন সব নীতি-ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ স্বপ্নে আমরা করিয়া বসি দিবাভাগে যাহাদের কথা চিন্তা করিতেও আমরা লজ্জায়, ঘৃণায় শিহরিয়া উঠি। অত্যন্ত সাধুপুরুষ বলিয়া যাহাদের খ্যাতি আছে তাহারাও স্বপ্নে অনেক ঘৃণ্য কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা ইহার মধ্যে বিস্ময়ের হেতু খুঁজিয়া পাইবেন না। আমরা কেহই নিষ্কলঙ্ক দেবতা নহি। আমাদের সকলের প্রকৃতির মধ্যেই আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষটা এখনও লুকাইয়া আছে। সভ্যতার প্রলেপটুকু একটু সরাইয়া ফেলিলেই সকলের ভিতর হইতেই বুনো-মানুষের কদর্য্যমূর্ত্তিটা বাহির হইয়া পড়িবে। Man, however, though in the making, is by no means made. The brute is but partly humanised—that is tamed. আদিমযুগের বন্যপ্রবৃত্তিগুলিকে

চাপিয়া রাখিবার জন্য আমাদের চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু চাপা দিলেই তাহারা যে নিঃশেষ হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিবার যত চেষ্টাই করি না—তাহারা সময়ে সময়ে আত্ম-প্রকাশ করে। তাহাদের এই আত্মপ্রকাশের সুযোগ মিলে রাতের স্বপ্নে, দিবাস্বপ্নেও বটে। তখন প্রহরীর চোখে নিদ্রা ঘনাইয়া আসে। আমাদের ভিতরের বন্যশূকরটা তখন দন্ত উঁচাইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতে থাকে, সর্প নিঃশঙ্কচিত্তে বিষ উদ্গীরণ করে, শকুনীটা অখাদ্যবস্তু কুণ্ঠা বর্জ্জন করিয়া উদরে পুরিয়া দেয়, নির্লজ্জ ছাগটা অতল হইতে চেতনার ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে।

স্বপ্ন আমাদের সমগ্ররূপটিকে চেতনার আলোকে প্রকটিত করে। আমাদের চেতনার বাহিরে বিপুল অন্ধকারময় প্রদেশে যে সকল ইচ্ছা তরঙ্গিত হইতেছে প্রহরীর সতর্কতার জন্য জাগ্রতমুহূর্ত্তগুলি তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারে না। স্বপ্নের রহস্যময় লোকে মনের অতল হইতে তাহারা জাগিয়া উঠে অনাবৃত মূর্ত্তি লইয়া। আমরা স্বপ্নলোকে নিজের সেই অনাবৃত রূপ দেখিয়া লজ্জায় শিহরিয়া উঠি সত্য কিন্তু সেই লজ্জার মধ্য দিয়া জানিতে পারি নিজের স্বরূপকে। স্বপ্নের এইদিক দিয়া একটা বিপুল সার্থকতা আছে। স্বপ্নের কষ্টিপাথরে আমাদের যথার্থ চেহারাটার

যাচাই হইয়া যায়। স্বপ্নের দর্পণে আমাদের মনের সত্যিকারের রূপটি প্রতিফলিত হইয়া উঠে। এখানে একটি কথা। স্বপ্নে নিজের কদর্য্য ইচ্ছা সবসময়েই যে অনাবৃত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে এমন নহে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম ইচ্ছা ছদ্মবেশ অথবা বিকৃতমূর্ত্তি লইয়া স্বপ্নলোকে দেখা দিয়া থাকে। "Such manifestations of the repressed in dreams are, in most cases, not direct but distorted expressions of the original wish". (*Outline of Modern Knowledge*).

আমাদের মনে যে যৌনক্ষুধা রহিয়াছে স্বপ্নে আমরা সেই ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করি সত্য কিন্তু স্বপ্নলোকেও সেই ক্ষুধাকে খোলাখুলিভাবে তৃপ্তিদান করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। আমাদের মনে যে যৌনপ্রবৃত্তিগুলি (sexual impulses) রহিয়াছে তাহাদিগকে চেতনার ক্ষেত্রে আমরা সহজে প্রবেশ করিতে দিই না। যখনই তাহারা আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে তখনই তাহাদিগকে আমরা চিন্তার ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি। বিতাড়িত ইচ্ছাগুলি মনের নির্জ্জনপ্রদেশে আশ্রয় লয় এবং সেইখানে জটিলগ্রন্থির (complexes) সৃষ্টি করে। এইসব যৌনইচ্ছা স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। খোলাখুলিভাবে করে

না—ভোল বদলাইয়া বিকৃতমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। উপর হইতে ভাসা-ভাসা ভাবে দেখিলে স্বপ্নের মর্ম্মকথা আমাদের বুদ্ধিতে ধরা দেয় না। রূপকের আবরণে আবৃত হইয়া সাধারণতঃ যৌন-ইচ্ছা স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সেই রূপকের (symbols) আবরণ যখন আমরা সরাইয়া ফেলি তখনই স্বপ্নের যথার্থ রূপ আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নলোকের অধিকাংশ রূপকই যৌনব্যাপারের সহিত জড়িত। ম্যাক্‌ডুগাল্, ইয়ুং (Jung) ইত্যাদি সাইকোএ্যানালিষ্টগণ বলেন, সমস্ত স্বপ্নকে যৌন ব্যাপারের সহিত জড়িত করা—ইহার পিছনে সত্য নাই। কতকগুলি স্বপ্নের মূলে অবশ্যই যৌনক্ষুধা থাকে, স্বপ্নে জননেন্দ্রিয় এবং জননেন্দ্রিয়ের কার্য্য খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ না করিয়া রূপকের আবরণ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে—ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আমরা যাহা কিছু স্বপ্নে দেখিয়া থাকি (অবশ্য ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি শারীরিক প্রয়োজন ছাড়া) সমস্তই যৌনব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট—সমস্তই সমাজের চাপে নিষ্পেষিত এবং অবদমিত যৌনইচ্ছার বিকৃত প্রকাশ—ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্তকে কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যৌন ব্যাপারকে জীবনে এতখানি বড় স্থান দেওয়াটাকে অনেকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ফ্রয়েডের এই মতকে

pan-sexuality বলিয়া উপহাস এবং বর্জ্জন করিয়াছেন। ম্যাকডুগাল সাহেব বলেন, মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত কতকগুলি মানুষের স্বপ্ন সম্বন্ধে যাহা সত্য সকল মানুষের সকল স্বপ্ন সম্বন্ধেও তাহাই সত্য—ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক। ম্যাক্‌ডুগালের মতে

"A principal error of Freud's treatment of dreams (as of neuroses) is too free and wide generalisation ; he too readily erects into general propositions, true of all dreams and of all men, conclusions of a speculative nature arrived at by the study of a limited number of cases, generally neurotic patients."—(*Oatline of Abnormal Psychology*, p. 187).

আমাদের মনের ইচ্ছা রূপকের আশ্রয় লইয়া স্বপ্নে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে ম্যাকডুগাল সাহেব নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। নিম্নে তাহা বিবৃত হইল। একটি ডিম্বাকৃতি ঘোড়দৌড়ের মাঠ। আমি সেই মাঠের মধ্যস্থলে অন্যান্য দর্শক হইতে কিছু দূরে রহিয়াছি। দূরে দেখিলাম, পঞ্চাশটি ঘোড়া ছুটিয়া আসিতেছে। যে পথে তাহারা আসিতেছে আমি সেই পথের একেবারে ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঘোড়াগুলি ঠিক আমার দিকেই আসিতেছিল। দেখিলাম কয়েকটি ঘোড়ার পিঠে আরোহী নাই। তবুও তাহারা পথ ধরিয়াই

ছুটিতেছিল। তাহারা ঠিক আমার পানে যখন আসিতেছিল তখন অগ্রগামী ঘোড়াটী সহসা আমার দৃষ্টির সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। বেশ বড়, কৃষ্ণবর্ণ জোরালো ঘোড়াটি চালের সঙ্গে আসিতেছে। পথ ছাড়িয়া ঘোড়াটি আসিতেছে ঠিক আমার পানে। একটু ভয় পাইয়া পিছনে সরিয়া যাইব মনে করিতেছি এমন সময় দেখিলাম, সরিবার পথ নাই—পশ্চাতে দশফিট উচ্চ তারের বেড়া। আমি ঘোড়ার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে সোজা আমার দিকে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে একলাফে ডিঙাইয়া গেল। তারের বেড়াটিকেও অতিক্রম করিল।

ঘোড়দৌড়ের পথটি হইতেছে জীবনের পথ। সেই পথে প্রতিযোগিতা করিতে করিতে সকলেই ছুটিতেছে। কাহারও কাহারও জীবনে কোন লক্ষ্য নাই। সৎপরামর্শ দিবার বন্ধু নাই—তাহারা ক্লান্ত তবুও তাহারা চলিয়াছে প্রতিযোগিতার স্পৃহা হইতে। আমি দূরে দাঁড়াইয়া একাকী সব দেখিতেছি। আমার উৎসাহ ম্লান হইয়া যাইতেছে, উদ্যম শিথিল হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধে দারুণ পরিশ্রমের ফলে আমি নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার ওজন ত্রিশ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল। কালো ঘোড়াটী হইতেছে আমার প্রাণশক্তির (libido) প্রতিমূর্ত্তি। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তি আমাকে ঘিরিয়া ছিল। ঘোড়াটী একলাফে সমস্ত অতিক্রম করিয়া গেল ;

ফ্রয়েড অবশ্য বলিবেন, আমি যৌনক্ষুধার দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার কাছে আমার স্বপ্নের তাৎপর্য্য অন্যরূপ। আমি জীবনের চলার পথে নূতন উদ্যমে যাত্রা সুরু করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

অনুশোচনার অসহবৃশ্চিকদংশনে পাগলিনীপ্রায় শৈবলিনী স্বপ্নে দেখিতেছেন, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটী পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন; ব্যাঘ্র তখনই ভিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখ। ব্যাঘ্র যেমন করিয়া মানুষ লইয়া যায় ফষ্টর একদিন তেমনি চন্দ্রশেখরের বাটী ডাকাতি করিয়া শৈবলিনীকে লইয়া গিয়াছিল। শৈবলিনীর স্বপ্নে ফষ্টর শ্বেতকায় মানবমূর্ত্তি হইয়া দেখা দিলনা, দেখা দিল বিকৃতমূর্ত্তিতে ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া। আর একবার নৈশগঙ্গাবিচারিণী তরণীমধ্যে নিদ্রিতা শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ভীমা-পুষ্করিণীর জলে তিনি পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছেন। সরোবরের প্রান্তে এক সুবর্ণনির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে। শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন ফষ্টরের মুখের মত। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

কামাতুর ফষ্টর শৈবলিনীর মনে যুগপৎ ঘৃণা এবং ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বপ্নে ফষ্টর তাই ঘৃণ্য শূকর হইয়া দেখা দিল। রাজহংস আর কেহ নহে, প্রতাপ। প্রতাপ শৈবলিনীর কাছে রাজহংসের মতই রমণীয় এবং লোভনীয় ছিল। স্বপ্নে তাই প্রতাপ সুবর্ণরাজহংস হইয়া শৈবলিনীর চেতনার ক্ষেত্রে দেখা দিল। এমনি করিয়া উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বপ্নের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা শুধু অলীক কল্পনামাত্র নহে, গভীর সত্যের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা। আমাদের মনের আসল ইচ্ছা স্বপ্নে ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে চায় কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে। এখানে বিবাহিতা শৈবলিনীর পক্ষে বিবাহিত প্রতাপকে পাওয়া যে সামাজিক কারণে একপ্রকার অসম্ভব জলতলে বদ্ধ চরণের দ্বারা সেই বাধার কথাই স্বপ্নে সূচিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। মোটের উপর বলিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয়, আমরা যে সকল ইচ্ছাকে চাপিয়া রাখি, চেতনার রাজ্যে আসিতে দিইনা—স্বপ্ন সেই সকল নিষ্পেষিত ইচ্ছাকে প্রকাশিত করে। এই প্রকাশের ভঙ্গিমা অধিকাংশক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট নহে; ইহা রূপকের আবরণে আবৃত থাকে। সেই আবরণ খুলিয়া ফেলিলে তবেই মনের আদিম আসল ইচ্ছাটীর পরিচয় পাওয়া যায়।

৯

দিবাস্বপ্ন ঃ—মানুষ আনন্দের কাঙাল আর যত রকমের আনন্দ আছে সবাইকে হার মানায় নারী পুরুষের মধ্যে এবং পুরুষ নারীর মধ্যে যে যৌন আনন্দ পায় সেই আনন্দ। আমাদের আদিম যৌনপ্রবৃত্তি আপনাকে চরিতার্থ করিতে চায়—কিন্তু সেই চরিতার্থতার পথে সামাজিক বাধা-নিষেধ রহিয়াছে বিস্তর। সেই বাধা-নিষেধের পাহাড় ঠেলিয়া ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করা সকল সময়ে সম্ভব নয়। বাঁচিতে গেলে বাস্তবের দায়কে স্বীকার না করিয়া তো উপায় নাই। কিন্তু আনন্দকে বর্জ্জন করাও তো মানুষের পক্ষে সহজ নয়। বাস্তবে যাহা তাহাকে দায়ে পড়িয়া বর্জ্জন করিতে হয়, তাহার জন্য কোনো না কোনো প্রকারের একটা ক্ষতিপূরণের সে প্রয়োজন বোধ করে। দিবাস্বপ্ন হইতেছে এই ক্ষতিপূরণের প্রশস্ত উপায়, তাহার ভোগের মানসিক রাজ্য। এই ভোগের মধ্যে বাস্তবের রূঢ় আঘাত নাই। বাস্তবের কঠিন শাসন মানুষকে যাহা ভোগ করিতে দেয় না—দিবাস্বপ্নের আশ্রয় লইয়া সে তাহা মনের সাধ মিটাইয়া ভোগ করে। সেই স্বপ্নরাজ্যে কোনো সমাজপতির শাসনদণ্ড গিয়া পৌঁছায় না। সেখানে নিষিদ্ধ আনন্দ ভোগ করিলেও ধরা পড়িবার বিন্দুমাত্র ভয় নাই। আনাতোল ফ্রাঁসের বৃদ্ধ পুরোহিত যেখানে চিরকুমারের

জীবন যাপন সত্ত্বেও কৌমার্য্যকে মানসিক ভোগের দ্বারা কালিমা লিপ্ত করে সে হইতেছে এই দিবাস্বপ্নের রাজ্য। এই দিবাস্বপ্নের রাজ্যে কত সতীসাধ্বী নারী যে পরপুরুষের সঙ্গ ভোগ করিতেছে তাহার সংখ্যা নাই—কত পুরুষ যে পরনারীতে উপগত হইতেছে তাহারও সংখ্যা নাই। আমাদের মনে এই যে কল্পরাজ্য আমরা গড়িয়া তুলি ইহার সঙ্গে আমরা তুলনা করিতে পারি রেলিঙ দিয়া ঘেরা পার্কগুলির। সেই পার্ক-গুলির বাহিরে যে ভূখণ্ড তাহার চেহারায় আদিম পৃথিবীর আকৃতির কোনো লক্ষণ নাই। তাহা কলকারখানায়, অট্টা-লিকায়, শান-বাঁধানো রাস্তায় এমন রূপ পাইয়াছে যাহা পৃথিবীর আদিমরূপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই নূতনের আবেষ্টনীর মধ্যে পার্কগুলি তাহাদের সবুজ তৃণভূমি—এমন কি আগাছাগুলি পর্য্যন্ত লইয়া পৃথিবীর আদিম চেহারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। আমাদের দিবা-স্বপ্নের রাজ্যেও আমরা আমাদের অন্তরের আদিম রূপ লইয়া অবস্থান করি। সেখানে আমরা বাস্তবের উদ্ধত বাহুকে একেবারেই প্রশ্রয় দিই না—সামাজিক বিধি-নিষেধের শাসনদণ্ডকে গণনার মধ্যে আনি না, সমাজ-সংসারের শীলমোহরের পবিত্র ছাপ না পাইলেও আমাদের ভোগের আনন্দ সেখানে একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এই দিবাস্বপ্নগুলির ছাঁচেই তৈরী হয় আমাদের রাতের স্বপ্নগুলি। ফ্রয়েডের মতে ঃ

These day dreams are the kernels and models of night dreams.

এই যে দিবাস্বপ্ন—এই স্বপ্ন থেকে আর্টে´রও জন্ম। আর্টি-ষ্টের জীবন অনেক কিছুর কাঙাল—খ্যাতির কাঙাল, ঐশ্বর্য্যের কাঙাল, শক্তির কাঙাল, নারীপ্রেমের কাঙাল। কিন্তু নিষ্করুণ বাস্তবে খ্যাতি, শক্তি, নারীর ভালবাসা সবই দুর্ল´ভ। আর্টিষ্ট তখন রামা-শ্যামা-যদুর মতোই নিজের মনের মধ্যে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে এবং সেখানে অপূর্ণ বাসনাগুলিকে ভোগে লাগায়। কিন্তু সাধারণ স্বপ্নবিলাসী মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাৎ আছে। আর্টিষ্ট তার স্বপ্নকে রাঙিয়ে এমন একটা রূপ দেয় যে সেই স্বপ্ন জনসাধারণের কাছে একজন ব্যক্তিবিশেষের স্বপ্ন ব'লে আর প্রতিভাত হয় না, সেই স্বপ্নের মধ্যে অন্যেরাও নিজের নিজের গোপন মনের ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করবার উপাদান খুঁজে পায়। আর্টিষ্টের স্বপ্ন তৃষাতুর প্রতিটি হৃদয়ের সান্ত্বনার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। আর্টিষ্ট তার আনন্দের নিষিদ্ধ উৎসটীকে এমন ক'রেই ঢেকে দেয় কল্পনাকে সহায় ক'রে যে লোকে ধরতেই পারে না উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার সত্যি কারের পরিচয়। অবশেষে কল্পনাকে সহায় ক'রে আর্টিষ্টের পক্ষে যা শুধু দিবাস্বপ্নে সম্ভব ছিলো তা জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়ায়,—খ্যাতি, সম্মান, নারীর প্রেম।

১০

মানুষ অন্তরে দেবতা—আমরা আমাদিগকে যত ভাল মনে করি আমরা ঠিক তত ভাল নই। আমাদের মনের কোণে অনেক কলুষ, অনেক ফাঁকি লুকাইয়া থাকে যাহার কথা আমরা নিকটতম বন্ধুর কাছেও বলিতে সাহস করি না। সেই ফাঁকির কথা প্রকাশ পায় শুধু আমার কাছে এবং আমার অন্তর্য্যামীর কাছে।

"লোকে যখন ভালো বলে
যখন সুখে থাকি,
জানি মনে তাহার মাঝে
অনেক আছে ফাঁকি।"

—রবীন্দ্রনাথ

আমি যখন সমাজে দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করি, তখন আমার ফাঁকিকে ঢাকিয়া রাখি ভদ্র আচরণের আবরণে। বাহিরে যখন হাসি ভিতরে তখন লুকাইয়া থাকে আঁখির জল। মুখে যখন মধু ক্ষরিতে থাকে অন্তর তখন ফেনিল হইয়া উঠে বিদ্বেষের বিষে। যখন আমি একা থাকি তখন আমার সম্মুখে দেখা দেয় আমার উলঙ্গ অনাবৃতরূপ।

কিন্তু আমার মধ্যে যে উলঙ্গ বর্ব্বর রহিয়াছে যাহাকে

ঢাকিবার জন্য আমি ভদ্রতার ছদ্মবেশ পরি—সেই বর্ব্বরটাই আমার সবটুকু নয়। তাহাকে একান্ত বড় করিয়া দেখিলে নিজের প্রতি অবিচার করা হয়। আমার মধ্যে কাঁদিতেছে নিঃসঙ্গ দেবতা। তাহাকে ত আমি জীবনে উচ্চ আসন দান করি নাই। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, পরিবার, সাহিত্য আমাকে যে সংস্কার এবং আচারের অচলায়তনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাদিগকেই আমি পদে পদে কুর্ণিশ করি। তাহারাই আমার জীবনের অনেকখানি স্থান নির্লজ্জভাবে জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমার সত্ত্বার যে অংশ এইভাবে সামাজিক নিয়মকানুন এবং আদব-কায়দার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাকে আমি আমার বাহিরের মানুষ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই বাহিরের মানুষটা হাসে, নাচে, গল্প করে, নিমন্ত্রণ করিয়া লোক খাওয়ায়, ঘটা করিয়া ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয়। মেয়ের শ্বশুর বাড়ী তত্ত্ব পাঠায়। পুরোহিতকে দক্ষিণা দেয়, শাস্ত্রের কাছে মাথা নোয়ায়, আপনাকে বসনভূষণে সাজায়। ইহার মুখে হাসি, ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, চুলে রেশমী ফিতা, অনামিকায় অঙ্গুরীয়, অঙ্গে সুন্দর পরিচ্ছদ; রেলে, ষ্টীমারে, কংগ্রেসে, উৎসব-প্রাঙ্গণে, নিমন্ত্রণ-সভায় এই বাহিরের মানুষটা সকলের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে; আদব-কায়দা ও আচার-অনুষ্ঠানের কোথাও

কোনো ক্রটী-বিচ্যুতি নাই। সকালে উঠিয়া ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করা, মাথার চুলগুলিকে পরিপাটি করিয়া আঁচড়ানো, বন্ধুর স্ত্রীকে বিবাহের উপহার দেওয়া, বৃদ্ধ-মা ও পিসিমাকে লইয়া তীর্থস্থান দেখানো, শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো, যাহাকে হয় ত ভালবাসি না, শ্রদ্ধা করি না তাহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জীবন-যাপন—এমনি কত কাজ আমার বাহিরের মানুষটা যন্ত্রের মত করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু আমার অন্দরের দেবতা যবনিকার অন্তরালে নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিতেছে। আচার অনুষ্ঠানের রাক্ষস-পুরীতে সে অশোক-কাননের সীতার মত একাকিনী, নিয়ম-কানুনের জটিলা-কুটিলা-পরিবৃতা হইয়া সে রাধার মত নিঃসঙ্গ। আমাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে লুকাইয়া আছে চিরকালের সেই বাঁধনহারা কপালকুণ্ডলা—অসীম সমুদ্রের ঘন-নীল স্বপ্ন যাহার চোখে, সুদূর আকাশের পিপাসা যাহার বুকে। বন তাহাকে মৌন ইসারায় কেবলই ডাকিতেছে; কোন কাপালিকের রক্ত চক্ষু, কোন নবকুমারের সোহাগ-চুম্বন তাহাকে বাঁধিতে পারে না। সে তটিনীর মত বন্ধনহারা; আপন চলার ছন্দে বিভোর হইয়া সুদূর সাগরের প্রেমে বিপুল অজানার পানে সে কেবলই চলিয়াছে। আমাদের রক্তে কাঁদিতেছে কৃষ্ণের

বাঁশী। সভ্যতার সহস্র আড়ম্বরের মধ্যে তাই আমাদের তৃপ্তি নাই। আমাদের মধ্যে বাজিতেছে শ্যামল অরণ্যের গান, উন্মুক্ত আকাশের বাঁশরী, অবারিত প্রান্তরের আহ্বান, কুলহীন সাগরের কলধ্বনি। আমাদের অন্দরের দেবতা মিথ্যার আবরণ ঠেলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চায় সত্যের মধ্যে; সঙ্কীর্ণতা তাহাকে পীড়িত করে, বন্ধন তাহাকে বেদনা দেয়, কপটতা তাহাকে আঘাত হানে, কদর্য্যতায় সে অশান্তি পায়। অন্তরের এই গোপন দেবতা —এই দেবতাকে আমরা অনুভব করি ব্যথার মধ্যে, অশান্তির মধ্যে। এই ব্যথা, এই অশান্তি আমাদের প্রত্যেকের বুকে। কিন্তু পাছে কঠোর সত্যের আঘাতে আমাদের সমাজ পরিবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, পাছে আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আঘাত পায়, এইজন্য অন্তরের এই কান্নার কথা স্বামী স্ত্রীকে বলে না, স্ত্রী স্বামীকে বলে না, বন্ধু বন্ধুকে বলে না, পিতা পুত্রকে বলে না, পুত্র পিতাকে বলে না। দেবতা আড়ালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সভ্যতার সহস্র উপাদান, সংসারের সমস্ত আয়োজন, পরিবারের সমস্ত সুখের অভিনয়ের মধ্যে মানুষের অন্তরতম দেবতার এই যে গোপন বেদনা, এই যে মৌন ক্রন্দন ইহারই ছবি আঁকিয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Sinclair Lewis তাঁহার Babbit, Main Street

প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্যে। সমস্ত বন্ধনের বিরুদ্ধে দেবতার এই বিদ্রোহের গানই উৎসারিত হইয়াছে হুইট্‌-ম্যানের কণ্ঠ হইতে। Shelly, Tolstoy, Ibsen, Edward Carpenter, Bernard Shaw—সকলের মধ্যেই বিদ্রোহী দেবতার এই অসন্তোষের সুর। মাঝে মাঝে কোথা হইতে আসে এইরূপ এক এক জন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাহারা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেয়; মানুষের গোপনতম কথা প্রকাশ করে। নির্ম্মম সত্যের অনাবৃত মুখের দিকে চাহিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। তাই সত্যের দুঃসহ আলোকচ্ছটাকে ভীরু সমাজ ঢাকিয়া রাখে মিথ্যার মনোহর আবরণে। সেই আবরণ রচনা করিয়া থাকে প্রবীণ পাকার দল আর স্বপ্ন-বিলাসী কবিদের বাক্যজালের অলীক ইন্দ্রধনুচ্ছটা। শেলী, ইবসেন, হুইটম্যান, বার্ণার্ড শয়ের মত মানুষেরা আসিয়া সেই আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলে, যাহা কালো তাহাকে কালো বলে, সত্যের অনাবৃত কঠোর নির্ম্মল রূপকে প্রকাশ করে। যে কথা সকলেই জানিত অথচ কেহ কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না, যে ব্যথা সকলেরই ব্যথা অথচ যাহা একে অন্যের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিত না, তাহাকে যে জানাইয়া দেয় সমাজ তাহাকে কোনদিনই ক্ষমা করে নাই। তাহাকে প্রবীণ পাকার দল ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে,

আগুনে পোড়াইয়াছে, তাহার পুত্রকন্যাকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, সমাজ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার উপর নিন্দা ও অপমানের বোঝা চাপাইয়াছে।

আমাদের মধ্যে বৃহত্তর, মহত্তর জীবনের জন্য এই যে বেদনা রহিয়াছে—এই বেদনাই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, আমি আমাকে যত ভালো বলিয়া মনে করিতাম তাহার অপেক্ষা আমি অনেক ভালো, অনেক বড়।

I am larger, better than I thought,
I did not know I held so much goodness.

(*Whitman*)

আমার মধ্যে দেবতা অমৃতের জন্য কাঁদিতেছে, তাই তো আমি বর্ত্তমানের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে চাই; তাইতো আমার মধ্যে এই চাঞ্চল্য, এই অতৃপ্তি, এই সুদূরের পিপাসা। আমি ভিতরে ভিতরে শুধু বর্ব্বর নহি, আমি ভিতরে ভিতরে দেবতা। যেখানে আমি বর্ব্বর সেখানে আমাকে সাবধানে হিসাব করিয়া পথ চলিতে হইবে; কিন্তু যেখানে আমি দেবতা সেখানে আমি আশা করিব, বিশ্বাস করিব, আপনাকে শ্রদ্ধা করিব; সেখানে কোন দুঃখে আমি বিমর্ষ হইব না, কোন পরাজয়ে পিছাইয়া যাইব না, কোন আঘাতে হৃদয়কে বিচলিত হইতে দিব না। অন্তরের

এই দেবতা-মানুষটীর প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন,

"The normal man is not only far more immoral than he believes (referring to the repressd tendencies) but also far more moral than he has any idea of (referring to the *Super-Ego*).

সাধারণ লোক নিজেকে যত খারাপ মনে করে তাহার অপেক্ষা সে অনেক খারাপ, আবার নিজেকে সে যত ভালো মনে করে তাহার অপেক্ষা সে অনেক ভালো।

আমার জীবনের রঙ্গভূমিতে আমার ক্ষুদ্র আমি এবং বৃহত্তর আমির মধ্যে সর্ব্বদাই দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। আমার জীবন আমার অন্দরের আমি এবং বাহিরের আমির মল্লযুদ্ধের একটা একটানা ইতিহাস। এই অন্দরের দেবতাকে কেহ বলিয়াছেন Higher Self, কেহ বা বলিয়াছেন the still small voice within. Whitmanএর ভাষায় বলিতে গেলে ইহাকে বলিতে হয়, "The potent, felt, interior command stronger than words."

জোলার (Zola) Doctor Pascal উপন্যাসে পরিচারিকা মার্টিনের অন্তরে এই লড়াই চলিয়াছে নিজের সঙ্গে নিজের। নারী মনিবকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে কিন্তু টাকার প্রতিও

তাহার আসক্তি যথেষ্ট। দৈবদুর্ব্বিপাকে প্রভু পথের ভিখারী, সম্পত্তি গিয়াছে খোয়া। মার্টিন এখন করে কি? প্রাণ চায় সব টাকা প্রভুকে অর্পণ করে কিন্তু টাকার মায়াও ছাড়িতে পারে না। উপন্যাসে আছে:

And thus, throughout an entire day, a terrible combat waged within her. Her love for her master—the love of a docile dog—battled with her love of money, the money which she had saved up copper by copper and hidden away in some secret nook where it was fructifying.

১০

কমপ্লেক্স (complex):—প্রহরী যে সকল ইচ্ছাকে চেতনার আলোকে আসিতে দেয় না, জ্ঞানের বাহিরে ঠেলিয়া দেয় সেই অনভিপ্রেত বিতাড়িত ইচ্ছাই Complex বলিয়া অভিহিত হয়। দলিত ইচ্ছা সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। বাঁকাচোরা পথে ভোল বদলাইয়া চেতনার ক্ষেত্রে উহা দেখা দেয়। প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে চিনিতে পারা মুস্কিল—কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, আমাদের অনেক বিতাড়িত বিদলিত

ইচ্ছাই পোষাক বদলাইয়া আমাদের স্বভাবের এবং আচার-ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায়। complexএর একটী দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে দিলাম। এই দৃষ্টান্তটী নেওয়া হইয়াছে ম্যাকডুগাল সাহেবের Abnormal Psychology হইতে।

Sunday Schoolএর একজন উৎসাহী ধর্ম্মশিক্ষক গোঁড়া নাস্তিক হইয়া গেলেন। ভগবান নাই—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার অপরিসীম উদ্যম দেখা যাইতে লাগিল। আপনার মত সপ্রমাণ করিতে বহুগ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিলেন। ধর্ম্মশিক্ষকের হঠাৎ এই ভাবান্তরের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখা গেলো, তিনি একটী মেয়েকে ভালবাসিতেন। ঐ মেয়েটী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার সহিত পলায়ন করেন তিনি ছিলেন তাঁহারই এক বন্ধু এবং Sunday Schoolএর একজন উৎসাহী সহকর্ম্মী। এই আচরণে সহকর্ম্মীর প্রতি তাঁহার মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া গেলো। বন্ধুর উপর এই তীব্র বিতৃষ্ণাই প্রকাশ পাইল পূর্ব্বের ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির উপর সুতীব্র বিতৃষ্ণারূপে। কারণ ঐ সকল বিশ্বাস যোগসূত্ররূপে বন্ধুর সহিত তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, আমাদের মনের তলদেশে অনেক বিতাড়িত ইচ্ছা আত্মগোপন করিয়া

থাকে। সেই গুপ্ত ইচ্ছাগুলিই অনেকসময়ে বিকৃতমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

Conflict and Repression :—আমাদের চিত্তভূমি কুরুক্ষেত্রের মত। সেখানে প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির এবং ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার সর্ব্বদাই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কতকগুলি ইচ্ছা আছে যাহাদের মূল আমাদের আদিম প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। যৌন ইচ্ছাকে আমরা এইরূপ একটী আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে গণ্য করিতে পারি। নরের নারীদেহের জন্য আকাঙ্ক্ষা এবং নারীর নরদেহের জন্য আকাঙ্ক্ষা—ইহা চিরন্তন। কোন্ আদিকাল হইতে নরনারী পরস্পরকে তনুমন দিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিতেছে। একদিন ছিল যখন মানুষ সহজভাবে তাহার যৌন-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারিত। বিধিনিষেধ তখন যে ছিল না এমন নহে। তবে এখনকার মত এত বেশী ছিল না। মানুষের সৃজন শক্তির প্রকাশ তখন দেহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে মানুষ সভ্যতার সোপানে যতই উঠিতে লাগিল ততই সে দেখিতে পাইল, কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি লইয়াই তাহার জীবন নহে! তাহার অন্তরের মধ্যে

রহিয়াছে অসীমের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিবার দুর্নিবার পিপাসা; তাহার আত্মায় আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন। অসীম জ্ঞান, অসীম সৌন্দর্য্য, অসীম প্রেম—ইহাদের আহ্বান তাহার রক্তের কণিকায় কণিকায় সে অনুভব করিতে লাগিল। মানুষ দেহের স্তর অতিক্রম করিয়া মনের স্তরে উঠিল এবং সমাজকে নূতনভাবে গড়িল। এই নূতন সমাজ আদিম প্রবৃত্তিগুলির আহ্বানকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না বটে কিন্তু বিধিনিষেধের সৃষ্টি করিয়া সেই প্রবৃত্তিগুলিকে খর্ব্ব করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিকে সমাজের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলগুলি এবং আর একদিকে আদিম প্রকৃতির দুর্ব্বার দাবী—এই দুইয়ের সংঘর্ষের ফলে আমাদের অনেকের জীবন ফেনিল, বিষময় এবং দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। আদিমপ্রবৃত্তির দাবীকে কতখানি স্বীকার করিয়া লইব এবং সমাজের বিধি-নিষেধকেই বা কতখানি মানিব—ইহা জীবনের এক গুরুতর সমস্যা। টলষ্টয় তাঁহার 'এ্যানা কেরেনিনা' উপন্যাসের নায়িকার জীবনে এই সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন—এ্যানা একদিকে মা এবং স্ত্রী, আর একদিকে 'ভ্রন্‌স্কি'র প্রেমে পাগল প্রণয়িণী, একদিকে স্বামী এবং সন্তানের দাবী আর একদিকে পরপুরুষের দুর্ব্বার আকর্ষণ! অবশেষে হতভাগিনী এ্যানাকে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিতে হইয়াছে মৃত্যুর শীতল

অন্ধকারে। যখন সমস্যার কোনরকমেই নিরাকরণ করিতে পারি না তখন তাহার সমাধানের জন্য আমরা অবদমন অথবা নিগ্রহের পন্থা অবলম্বন করি। Repression seems to be Nature's crude way of dealing with conflicts. মনের মধ্যে যৌন ইচ্ছা বা অন্যকোন আদিম ইচ্ছা জাগিলেই সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলি। ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার সংঘর্ষ হইতে মনের মধ্যে যে অশান্তি জাগে, একটী ইচ্ছাকে দমন করিবার ফলে সেই অশান্তির হস্ত হইতে কিছুকালের জন্য আমরা রক্ষা পাই এবং তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, আঃ, বাঁচিলাম।

কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। সমাজ ও প্রকৃতি এই উভয়ের দাবীর মধ্যে সমাজের দাবী মানিয়া লইয়া মনে করিলাম, খুব জিতিয়া গিয়াছি—তুই সতীনের টানাটানির মধ্যে পড়িয়া আর প্রাণান্ত হইতে হইবে না ; প্রত্যাখ্যাতা প্রকৃতি এবার নিষ্কৃতি দিবে !

কিন্তু প্রকৃতি এত সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দেয় না। সে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া নিঃশব্দে প্রতিশোধের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়। আমাদের এই আদিম প্রকৃতি বেগবতী পার্ব্বত্য নদীর মত। আমরা এই নদীর সম্মুখে নিগ্রহের পাথর ফেলিয়া মনে করি, জলধারাকে পাষাণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিলাম। নদী কিন্তু বাঁধা পড়ে না। সোজা সহজ

পথ ছাড়িয়া উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া আবর্ত্ত রচনা করিয়া অন্য-পথে প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে।

আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। সেই প্রবৃত্তিগুলির বেগ অতি প্রচণ্ড; মনের যৌন ইচ্ছার দুর্ব্বার শক্তিকে ফ্রয়েড বলিয়াছেন libido. এই libidoর সহজ প্রকাশকে যখনই আমরা চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করি ধর্ম্মের নামে, নীতির নামে, সংযমের নামে—তখনই দেখিতে পাই, অবরুদ্ধ ইচ্ছা মনের অতল গুহায় ফেনিল আবর্ত্তের সৃষ্টি করে। আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা দারুণ সংগ্রাম চলিতে থাকে। সেই সংগ্রাম নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম। একদিকে উদ্দাম আদিম যৌন প্রবৃত্তির দাবী, আর একদিকে সংযমের দাবী, ত্যাগের দাবী, নীতি-ধর্ম্মের দাবী। যুদ্ধ করিতে করিতে মনের শক্তি চলিয়া যায়, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়, অশ্রুজলে এবং দীর্ঘশ্বাসে জীবন ভরিয়া উঠে, আমরা দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়ি।

আমাদের অনেক মনের অসুখের কারণ এই অবদমন অথবা নিগ্রহ। নিগৃহীত ইচ্ছাগুলি মনের কোণে জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত উৎকট আকারে আচারে ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে। হিষ্টিরিয়া অসুখের কারণ অনেক সময়েই এই নিগ্রহ। বাল্যেই স্বামী হারাইয়াছে—এমন অনেক

বর্ষীয়সী পল্লীবিধবাকে পরছিদ্রঅন্বেষণে অত্যন্ত উৎসাহী দেখা যায়। কে কাহার সহিত কু-অভিপ্রায়ে হাস্যালাপ করিয়াছে, কাহার সহিত কাহার অবৈধ প্রণয় জন্মিয়াছে— পল্লীর সমস্ত ঘটনা তাহাদের নখদর্পণে। সেই সমস্ত প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার লইয়া পথে ঘাটে তাহাদের আলোচনার অন্ত নাই। অন্যের প্রেমঘটিত দুর্ব্বলতা লইয়া এই অত্যধিক মাথা-ঘামানোর মূলে নিজের নিগৃহীত যৌনইচ্ছার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নাই। অনেক সময় এইরূপ নারীর দিকে কেহ নির্ম্মলদৃষ্টিতে চাহিলেও সে মনে করে এবং বলিয়া বেড়ায়, অমুক লোকটা অত্যন্ত দুশ্চরিত্র। সে নারীর মর্য্যাদা জানে না। আসলে মেয়েটীর নিজের মনেই যৌন ইচ্ছা জাগিয়া রহিয়াছে। নিজের সেই অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই সে অন্যের উপর বৃথা আরোপ করে।

উপরে প্রবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তির, ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হইয়াছে—সেই দ্বন্দ্ব দুই প্রকারের হইতে পারে। একপ্রকার দ্বন্দ্ব আছে যাহা পথের অনৈক্য লইয়া। লক্ষ্য স্থির আছে, আদর্শ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ একাধিক। ঠিক কোন্ পথে সহজে এবং সত্বর লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারা যাইবে তাহা স্থির করা অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে। সন্দেহ দোলায় দোলায়মান চিত্ত আমাদিগকে ঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। এই

যে পথের দ্বন্দ্ব—এই দ্বন্দ্বের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া আমাদের শক্তির অনেক অপচয় হইয়া থাকে কিন্তু psycho-analysisএ যাহাকে conflict বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই পথের দ্বন্দ্ব নহে।

Psycho-analystদের মতে দ্বন্দ্বের (conflict) অর্থ হইতেছে দুইটি পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যের (motive) বা ইচ্ছার মাঝে দ্বন্দ্ব। একটি ইচ্ছার সহিত আর একটি ইচ্ছার কোন সামঞ্জস্যই থাকে না। বিভিন্ন ইচ্ছা বিভিন্ন লক্ষ্যের পানে মনকে আকর্ষণ করে। এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া আমরা হাবুডুবু খাইতে থাকি। আমাদের অন্তঃকরণ বিভিন্ন ইচ্ছার সংঘাতে ফেনিল হইয়া উঠে। মানসিক শান্তি চলিয়া যায়, চিত্তকে একমুখী করিতে পারি না, অবসাদের মেঘে মন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মন আজ নোঙর-ছেঁড়া নৌকার নত লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। নানাদিক হইতে নানা আদর্শ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। ওয়াল্‌ট হুইটম্যান, ওমর খৈয়াম, বার্ণার্ড শ, ইবসেন, বুদ্ধ, কনফিউসিয়াস—প্রত্যেকেই আমাদের কর্ণে নিজ নিজ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। একজন বলিতেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম জন্ম ধরিয়া; আর একজন বলিতেছেন, দুজনের মধ্যে যদি কোন একজন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে চায় তাহার সেই চিরন্তন অধিকার আছে। বিবাহে ভগবানের

কোন হাত নেই ; বিবাহ দেয় পুরুতে ; উহা সন্তান প্রজননের জন্য সমাজের দেওয়া একটা অনুমতি ছাড়া আর কিছুই নহে। বিবাহ domestic prostitution. একজন বলিতেছেন, যৌন ক্ষুধার মধ্যে রহিয়াছে নিছক জানোয়ারের ধর্ম্ম ; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সকল সময়েই ভাই-বোনের সম্পর্ক থাকা উচিত , অন্য কোন সম্পর্ক দূষণীয়। আর একজন বলিতেছেন, দেহের ক্ষুধার মধ্যে অন্যায় কিছুই নাই ; দেহকে বাদ দিয়া যে প্রেম তাহার মধ্যে নিবিড়তা থাকে না। ফুল আকাশের তলায় আলোকে ফোটে কিন্তু লতার শিকড় থাকে মাটির মধ্যে। মাটীর রস না পাইলে আলোয় ফুল ফোটে না। নরনারীর মধ্যে দেহের মিলন না হইলে প্রেমের ফুলও ভাল করিয়া ফোটে না, উহা কুঁড়ি থাকিয়া যায়। একজন বলিতেছেন, দেশাত্মবোধ অতীতের কু-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে আছে সঙ্কীর্ণ চিত্তের ক্ষুদ্র স্বাজাত্যাভিমান। উহা মানুষের চারিদিকে প্রাচীর উত্তোলন করিয়া তাহাকে বিশ্বমানবের স্পর্শ হইতে দূরে দূরে রাখে। ইহা বিশ্বপ্রেমের পথে ঘোর অন্তরায়। আর একজন বলিতেছেন, জন্মভূমি স্বর্গের অপেক্ষা গরীয়সী। জন্মভূমি কখনও অন্যায় করিতে পারে না। তাহার দাবী সকল দাবীর উচ্চে। My country right or wrong. স্বদেশ যদি কখনও অন্যায় করে তবুও স্বদেশকে দেহ-প্রাণ দিয়া

সমর্থন করিতে হইবে—কারণ সে যে স্বদেশ! একজন বলিতেছেন, হিংসা সর্ব্ব অবস্থাতেই নিন্দনীয়। উহা জংলী পশুর ধর্ম্ম। আর একজন বলিতেছেন, এমন কিছুই নাই যাহা সর্ব্ব অবস্থাতেই নিন্দনীয় অথবা সর্ব্ব অবস্থাতেই প্রশংসনীয়। মানুষকে হিংসা-অহিংসার উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, তাহাকে ভগবানের হাতের যন্ত্র হইতে হইবে। এমনি করিয়া সংসারের ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে। মুনিরা প্রত্যেকেই নিজস্ব মতকে ব্যবস্থার শেষ কথা বলিয়া জাহির করিতেছেন। নানা মুনির নানা মত। Free Love, Birth Control কত নীতিই না প্রচারিত হইতেছে। কত নূতন নূতন কথা ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন শুনিতেছে, পুস্তকে পড়িতেছে। তাহারা শোনে, ধর্ম্ম জিনিষটা পুরাকালের কতকগুলি কু-সংস্কার-সম্পন্ন গোঁড়া লোকের দুর্ব্বল চিত্তের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কাঙাল মনের দৈন্য এবং দুর্ব্বলতার পরিচয়। রাজনীতির চর্চ্চা দুষ্টলোকের পেশা; বিজ্ঞান মানুষের উচ্চতর বৃত্তির বিকাশের পথে অন্তরায়; এমনি কত কথাই না প্রতিদিন তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।

এমনি একটা আশাহীন, আলোহীন জগতে মানুষের চিত্ত আশ্রয়হীন মাতৃহারা বালকের মত হাহাকার করিয়া ফিরে। কোন কিছুতেই সে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস স্থাপন

করিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দুর্নীতির প্রসার হইবে, বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে, বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা আছে কি না—হাজার হাজার তরুণতরুণীর মনে এই প্রশ্ন জাগিবে, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে —ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

পূর্ব্বে ঠিক এমনটি ছিল না। তখন জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ জাগিবার বিশেষ অবসর ঘটিত না। বিপুল আদর্শের ছায়ায় মানুষের চিত্ত তখন ফুলের মত সহজে বিকশিত হইয়া উঠিত। পত্নীর আদর্শ, ভ্রাতার আদর্শ, পতির আদর্শ, সন্তানের আদর্শ ধ্রুবতারার মত অচঞ্চল ছিল। সেই সকল আদর্শে নরনারী অকপটভাবে বিশ্বাস করিত; সেই অবিচলিত অবিসংবাদী আদর্শের (unquestioned ideals) কষ্টিপাথরের মানুষ অকুণ্ঠিত চিত্তে ভালমন্দের যাচাই করিয়া লইত। সেই সকল আদর্শ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে প্রেরণা দিত, জীবনের পথে চলিবার পুষ্টিকর খোরাক এবং পাথেয় যোগাইত। রামায়ণ, মহাভারতের অমর কথা যাত্রা, কথকতা, পাঁচালির সাহায্যে গৃহে গৃহে প্রচারিত হইত; ছেলেমেয়েরা মা-ঠাকুরমা-পিসীমার মুখ হইতে শুনিত—সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী, রাম-লক্ষ্মণ-অর্জ্জুনের জীবন-কথা। শুনিতে শুনিতে তাহাদের ভাব-প্রবণ তরুণচিত্ত মহাপুরুষ এবং মহীয়সী নারীদের আদর্শে

অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিত। বালিকারা স্থির করিত, বড় হইয়া তাহারা সীতা-সাবিত্রীর মত পতিব্রতা হইবে, জীবন থাকিতে সতীত্বে কলঙ্ক লাগিতে দিবে না, স্বপ্নেও পরপুরুষের চিন্তা করিবে না। বালকেরা মনে করিত, তাহারা অর্জ্জুনের মত বীর হইবে, রামের মত সত্যনিষ্ঠ হইবে, লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃবৎসল হইবে, ধ্রুবের মত ঈশ্বরভক্ত হইবে, প্রহ্লাদের মত সত্যের জন্য সকল দুঃখ মাথায় তুলিয়া লইবে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইবার একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা ছিল। কতকগুলি আদর্শের প্রতি মানুষের অবিচলিত শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিত। জীবনের পথে সে একটা লক্ষ্যের সন্ধান পাইত। কোন্ আদর্শ সত্য, কোন্ আদর্শ মিথ্যা, ইহা লইয়া তাহাকে অনবরত সন্দেহ-দোলায় দুলিতে হইত না। দ্বিধাভরে অন্ধকারে তাহাকে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পথ চলিতে হইত না। সে জানিত তাহার জীবনের লক্ষ্য কি এবং কোন অবস্থায় তাহাকে কি করিতে হইবে। ফলে তাহার জীবন বিরোধ-কোলাহলে ভরিয়া উঠিত না, শান্তির শুভ্র জ্যোতি তাহার জীবনপথে আলোক বিকীর্ণ করিত; মহান আদর্শের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস তাহার চরিত্রকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিত। যখনই আদিম বন্য প্রবৃত্তি তাহাকে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে প্ররোচিত করিত—আদর্শের শুভ্র কিরণসম্পাতে

সেই প্ররোচনা সূর্যোদয়ে অন্ধকারের মত মুখ ঢাকিয়া পলাইত।

আজ মানুষের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাহার দুর্দ্দশা ভিতর এবং বাহির—উভয়কে লইয়া; বাহিরে সে উলঙ্গ, শীতার্ত্ত, বুভুক্ষু, নিরাশ্রয়; কদর্য্য দারিদ্র্য তাহাকে পশুর সামিল করিয়া রাখিয়াছে। ভিতরে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাতের ফলে একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার জীবনতরণী বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার হৃদয় হইয়াছে প্রাচীন Roman Amphitheatreএর মত লড়াইয়ের আখড়া। Socialist মানুষকে বাহিরের বাধা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। Psycho-analyst মানুষকে ভিতরের বাধা হইতে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

মনের জীবন লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের মতে অধিকাংশ মানসিক ব্যাধির এবং চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের কারণ Serious Moral Conflicts. ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার এই দ্বন্দ্বের যখন অবসান করিতে পারি না তখনই আমরা repression বা অবদমনের আশ্রয় লই। জোর করিয়া একটি ইচ্ছাকে চেতনার বাহিরে ঠেলিয়া দিই। দ্বন্দ্ব থাকিলেই যে ব্যাধির সৃষ্টি হইবে এমন কোন কথা নাই। অবদমন যে সর্ব্বঅবস্থায় অশুভ—ইহাও ঠিক নহে।

যখন আমরা অনভিপ্রেত ইচ্ছাগুলিকে চিনিয়াও চিনি না, তাহাদিগকে প্রকাশ্যে স্বীকার করি না, নিজের তুর্ব্বলতা ঢাকিবার জন্য ছদ্মবেশ পরাইয়া তাহাদিগকে মনের কোণে আশ্রয় দিই, নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি, ভাবের ঘরে চুরি করি, ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাই, নিজেকে জানি না, বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করি না, সহজভাবে নিজের সমালোচনা করিতে সাহসী হই না, তখনই আত্মজ্ঞানের অভাব এবং আত্মপ্রবঞ্চনার ফাঁকিকে আশ্রয় করিয়া মনের মধ্যে রোগ বাসা নির্ম্মাণ করে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দ্বন্দ্ব এবং অবদমন (Conflict and Repression) যখন সমস্ত মানসিক বিশৃঙ্খলার মূলে তখন অবদমন না করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের আদিম যৌন স্পৃহাকে জোর করিয়া শৃঙ্খলিত করিবার ফলেই যখন আমরা মনের মধ্যে নানারকম ফেনিল এবং জটিল আবর্ত্তের সৃষ্টি করি তখন স্বভাবকে নিগ্রহ করিয়া লাভ কি? এই নিগ্রহ কেবল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় না; ইহার দ্বারা জীবনের সহজ প্রকাশকে আমরা অবরুদ্ধ করি।

কিন্তু প্রবৃত্তির বা ইচ্ছার স্রোতে self-expression-এর নামে এই গা ঢালিয়া দেওয়ার নীতিকে আমরা কোন ক্রমেই সমর্থন করিতে পারি না। Conflict is inevitable, and repression is necessary for those who

would live on a higher plane than brutes. পশুর মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, জানোয়ার কখনো তাহার প্রবৃত্তিকে সংযত করে না ; তাহাদের মধ্যে যখন যে ইচ্ছা জাগে সেই ইচ্ছাকে তাহারা পরিতৃপ্ত করিবার প্রয়াস পায়। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার দ্বন্দ্ব এবং অনভিপ্রেত দুষ্ট ইচ্ছাকে দলিত করিবার প্রয়াস আমরা মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে ক্রোধ জাগিলে সে অক্রোধের দ্বারা সেই ক্রোধকে জয় করিবার চেষ্টা করে ; তাহার মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হইলে সে ভয়কে জয় করিয়া অত্যাচারীর নির্য্যাতনকে হাস্যমুখে বরণ করিয়া লয় ; তাহার মধ্যে দুর্দ্দমনীয় কামনা জাগিলে সে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে জোর করিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনকে টানিয়া আনে। এই সংযম না থাকিলে মানুষের ইতিহাস আজও বর্ব্বর-যুগের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। তাহার আদিম জংলী প্রবৃত্তির বেগকে সংযত করিতে করিতে সে আজ এই সভ্যতার স্তরে উঠিতে পারিয়াছে। এই সংযমই তাহার সমস্ত কৃষ্টির মূলে এবং ইহাই তাহার বহির্মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়াছে। অবশ্য নিগ্রহ সর্ব্ব অবস্থাতেই মঙ্গল প্রসব করে—এরূপ ধারণাও ভুল। দ্বাদশ-বর্ষের বালবিধবাকে আলোচাল আর কাঁচকলা ভাতে ভোজন করাইয়া, ভাগবত শুনাইয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইবার চেষ্টা করিলে ফল যে সব সময়

শুভ হয়—এরূপ বিশ্বাস আমাদের নাই। যৌনমিলনের পিছনে রহিয়াছে প্রকৃতির চিরকালের বিধান যাহাকে Bernard Shaw বলিয়াছেন Life Force. সৃষ্টির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা প্রকৃতির ইচ্ছা। তাহার জন্যই প্রকৃতি নরনারীর মধ্যে যৌনক্ষুধা দিয়াছে। তবে যে হেতু যৌনক্ষুধা প্রকৃতিরই সৃষ্টি সেই হেতু পাত্রাপাত্র এবং কালাকাল বিচার না করিয়া সেই ক্ষুধা মিটাইতে হইবে—ইহারও কোন অর্থ নাই। পূর্ণ জীবন সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছুই নহে। ভোগ এবং ত্যাগ, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ের মধ্যে চাই সুন্দর সামঞ্জস্য। নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিয়াও নহে, নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াও নহে, নিগ্রহ করিয়াও নহে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাকে যথেচ্ছভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াও নহে, অন্তরের বিচিত্র সুরকে মিলাইয়া এক সুন্দর ঐক্যতানের সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ এবং মুক্তিকে আমরা খুঁজিয়া পাইব। What is needed is wise sublimation of the repressed forces, in the light of clear and frank self-knowledge and under the guidance of high ideals and of well-tried moral traditions.

এই বিপুল সুন্দর সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মহাকবি হুইট্‌ম্যান লিখিলেন,

> "I have said that the soul is not
> more than the body,

> And I have said that the body is not
> more than the soul,
> And nothing, not God, is greater to one,
> than one's Self is."
>
> —(Song of Myself).

"আমি বলিয়াছি, শরীর হইতে আত্মা বড় নহে, এবং আমি ইহাও বলিয়াছি, শরীর আত্মা হইতে বড় নহে, এবং মানুষের নিজের কাছে তাহার ব্যক্তিত্ব যতখানি বড় এত বড় কিছুই নহে, ভগবানও নহেন।"

বিভিন্নমুখী ইচ্ছার টানাটানির হাত হইতে ব্যক্তিত্বকে মুক্তিদান না করিলে উহার বিকাশ হইতে পারে না। নানা ইচ্ছা নানাদিকে ধাইয়া চলিয়াছে। সেই ইচ্ছাগুলিকে একটী সূত্রে বাঁধিয়া যখন আমরা তাহাদিগকে এক মহান আদর্শের পানে পরিচালিত করিতে পারি তখনই আমরা চরিত্রসম্পদে ধনী হইয়া উঠি। বিভিন্ন ইচ্ছার মধ্যে এই সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতাই চরিত্রবলের পরিচয়। একটী অত্যুচ্চভাব যখন জীবনের অন্যান্য ইচ্ছাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিজের পথে পরিচালিত করে তখন জীবন দ্বন্দ্বাতীত হয়। সেই দ্বন্দ্বাতীত জীবনে সমস্ত বিরোধ-কোলাহল এক উদাত্ত গম্ভীর সুরের মধ্যে ডুবিয়া যায়। অসম্পূর্ণ চরিত্রে ধনের আকাঙ্ক্ষা, যশের আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা অত্যুগ্র হইয়া উঠে। ইহার দ্বারা দ্বন্দ্বের অবসান হয় না। কখনো কখনো পরস্পর বিরোধী দুইটি আকাঙ্ক্ষাই জীবনের রঙ্গভূমিতে একই

সময়ে আধিপত্য করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করে। মন চায় একদিকে ঐশ্বর্য্যের পূজা করিতে, আর একদিকে বিদ্যার পূজা করিতে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর টানাটানির মধ্যে পড়িয়া প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হয়।

এজন্য জীবনের বেদীতে এমন একটী আদর্শকে দেবতা করিয়া বসাইতে হইবে যাহার কাছে সমস্ত ইচ্ছা নতমস্তকে অর্ঘ্যদান করিবে। যখনই বিভিন্নমুখী ইচ্ছা বা প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে তখনই সেই আদর্শের প্রভাবে সমস্ত বিরোধের অবসান হইয়া যাইবে। সেই আদর্শ হইবে সমুদ্রের মত গভীর, আকাশের মত ব্যাপক এবং হিমালয়ের মত উচ্চ—যথা God, Truth, Beauty. উহার মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত ইচ্ছা আপনার যথার্থ স্থান খুঁজিয়া পাইবে। এইরূপ আদর্শ হইতেছে স্থিতপ্রজ্ঞ অথবা যতাত্মা হইবার আদর্শ। And of such master purposes, the one most truly and universally effective is the purpose of being an efficient autonomous personality, a character capable of choosing and following whatever line of conduct reason may point to us the best—(*MacDougall's Outline of Abnormal Psychology, p.* 526).

১৩

উদ্গতি (Sublimation) : নিগ্রহ অথবা অবদমন আমাদের কল্যাণের পথে অন্তরায় কি না—এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। তবুও এখানে উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা বলিলে বোধ হয় পুনরুক্তির অপরাধ হইবে না। নিগ্রহ আমাদের দেহের এবং মনের কি পরিমাণ ক্ষতি করে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অবদমনের মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ইহা অস্বাভাবিক। দেহ এবং দেহের ক্ষুধাকে অস্বীকার করিবার এবং ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদিগকে কে দিয়াছে? আমার দেহ ভগবানের মন্দির, আমার প্রতি অঙ্গে বিধাতার চুম্বনের ছাপ।

> "I believe in the flesh and the appetites,
> Seeing, hearing, feeling are miracles,
> And each part and tag of me is a miracle."
>
> (– *Whitman : Song of Myself*).

ছেলেবেলা হইতে আমরা শুনিয়া আসি, মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা একটা অপরাধের ব্যাপার। দেহের ক্ষুধার মধ্যে আছে কেবল পশুর প্রবৃত্তি। ফলে প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা

গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করি। পারি না; প্রকৃতি পরিশোধ লয়। নিজের সঙ্গে অহর্নিশি সংগ্রাম করিতে করিতে অন্তর্বিরোধের অনলতাপে আমাদের অন্তরের বীর্য্য শুকাইয়া যায়। এই জন্যই মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন,

To achieve the maximum of sublimation we shall find it necessary to be more tolerant to the demands of instinct than has hitherto been the case.

"আমাদের অন্তরের যৌন প্রবৃত্তিকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইলে একটী জিনিষের প্রয়োজন আছে। আমরা এপর্য্যন্ত প্রবৃত্তির দাবীগুলিকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছি; এখন হইতে এই দাবীগুলির প্রতি আমাদিগকে আরও সদয় হইতে হইবে।"

কিন্তু impulse বা সহজ আদিম প্রবৃত্তি যখন একান্ত বড় হইয়া উঠে তখনও সর্ব্বনাশের কারণ ঘটে। আমাদের মনে যখন যে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে তাহাকেই তখন যদি পরিতৃপ্ত করি তবে তো পশুর স্তরে আমরা নামিয়া যাইব। আমাদের মনের মধ্যে যে libido বা যৌনইচ্ছার দুর্ব্বার শক্তিপুঞ্জ রহিয়াছে তাহাকে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির পথে যথেচ্ছ পরিচালিত করিলে উচ্চতর প্রবৃত্তির বিকাশ হওয়া অসম্ভব। আমাদের জীবন শুধু দেহকে ঘিরিয়া নহে। দেহকে ছাড়াইয়া আমরা মনের ক্ষেত্রেও বিচরণ করিতে পারি। আমরা কেবল আহার এবং বংশবৃদ্ধি করি না; আমাদের মধ্যে রহিয়াছে সুদূরের পিপাসা, সুন্দরের

স্বপ্ন, আলোকের ধ্যান। সেই পিপাসা এবং স্বপ্ন হইতে যুগে যুগে কবিতার জন্ম হইয়াছে, সঙ্গীতের প্রস্রবণ বহিয়াছে, তাজমহল ফুটিয়াছে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ঘটিয়াছে। অন্তরের সমস্ত শক্তি যদি ইন্দ্রিয়ের পথে ধাবিত হইয়া আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তবে মনের রাজ্যে আমরা দেউলিয়া হইয়া যাইব। এই জন্য শক্তির সঙ্গে সংযমের প্রয়োজন। যে বিরাট আদি-শক্তির উৎস হৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই শক্তির খানিকটা অংশ আদিম যৌন-প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করা সমীচীন; কিন্তু সেই প্রবৃত্তির খেলা কখনো উদ্দাম হইবে না। যৌন শক্তিকে উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। শক্তির ধারাকে ইন্দ্রিয়ের খাত হইতে উচ্চতর সৌন্দর্য্য এবং আনন্দস্থষ্টির নব নব খাতে বহাইতে হইবে। মানুষের ইতিহাসকে যাঁহারা প্রতিভার দানে সম্পদশালী করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই যৌনশক্তি রূপান্তরিত হইয়া প্রেমের মধ্যে, সৌন্দর্য্য-স্থষ্টির মধ্যে আপনাকে সার্থক করিয়াছে। তাহা উদ্দাম ভোগের পথে অথবা অন্তরের দ্বন্দ্বের জটিলতার মধ্যে ব্যর্থ হয় নাই।

"All great mystics and the majority of great idealists, the giants among the creators of spirit have clearly and instinctively realised what formidable

power of concentrated soul, of accumulated creative energy, is generated by the renunciation of organic and psychic expenditure of sexuality. Even such free thinkers in matters of faith, and such sensualists as Beethoven, Balzac and Flaubert, have felt this. (*Romain Rolland—Ramkrishna's Life*).

Chastity is the flower of man ; and what are called Genius, Heroism, Holiness and the like, are but various fruits which succeed it. (*Thoreau, Walden*).

আমাদের বক্তব্য বিষয়কে আরো পরিস্ফুট করিবার জন্য আমরা রোমাঁ রলাঁ এবং থোরোর লেখা উপরে উদ্ধৃত করিলাম। যৌন শক্তিকে (libido) এই উচ্চতর শক্তিতে রূপান্তরিত করাকেই ফ্রয়েড বলিয়াছেন sublimation বা উদ্গতি।

মানুষের সহজপ্রবৃত্তি হইতেছে নিজের স্বার্থকে অনুসন্ধান করা। তাহার libido বা প্রাণশক্তিকে সে স্বভাবতই পরিচালিত করে আত্মপ্রীতির পথে। এই আত্মপ্রীতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে যখন আমরা দেশপ্রীতিতে রূপান্তরিত করি, নিজের প্রতি ভালবাসাকে যখন আমরা প্রতিবেশী-আত্ম-বন্ধু-অতিথি-অনাথে পরিব্যপ্ত করিয়া দিই তখন আত্মপ্রীতির সেই বিস্তার sublimation ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুষের মধ্যে যত কিছু উচ্চতর প্রবৃত্তি

দেখা দিয়াছে তাহা sublimationএর ফল। প্রেম এইরূপ একটি উচ্চতর প্রবৃত্তি যাহার কথা আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে পারি। একটি সভ্য যুবক ভালবাসিয়া কোন বালিকাকে যখন আপনার ধর্ম্মপত্নী করিতে ইচ্ছা করে তখন তাহার সেই ভালবাসা অত্যন্ত কমনীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্ব্বর মানুষ বাঞ্ছিতা রমণীকে লাঠির আঘাতে ভূপাতিত করিয়া তাহাকে গুহায় বহন করিয়া লইয়া যায় আপনার বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। সভ্য মানুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ অসম্ভব। সভ্যযুবকও বালিকার দেহকে পাইতে চায়—তাহার মধ্যেও যৌনক্ষুধা রহিয়াছে। কিন্তু সেই ক্ষুধাকে বর্ব্বরের মত নিষ্ঠুর কদর্য্যভাবে পরিতৃপ্ত করিতে তাহার সমস্ত প্রাণ কুণ্ঠিত হইয়া উঠে। বালিকার দেহকে সে জোর করিয়া কখনও অধিকার করিবে না। সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে প্রিয়ার হৃদয় জয় করিতে। সে এমন কাজ কখনই করিবে না যাহাতে বালিকার মনে কোনপ্রকার আঘাত লাগে, তাহার সম্মান কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হয়। সভ্য মানুষ তাহার প্রেয়সীকে যখন জীবনের সঙ্গিনী করিতে চায় তখন যৌনইচ্ছা কখনই তাহার কাছে একান্ত বড় হইয়া উঠে না। প্রেয়সীকে পাওয়ার ইচ্ছার মধ্যে যৌনক্ষুধা বিদ্যমান থাকে সত্য কিন্তু সেই ক্ষুধার সঙ্গে আরও অনেক ইচ্ছা জড়িত হইয়া

থাকে। সেই আরও অনেক ইচ্ছার মধ্যে থাকে প্রিয়াকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবার কোমল প্রবৃত্তি, তাহার কাছে আপনাকে সমর্পণ করিবার, নত করিবার ইচ্ছা। এই জন্য সভ্যযুবক যখন তাহার প্রিয়তমাকে বিবাহ করিতে চায় তখন শুধু তাহার দেহকেই পাইতে চায় না, সে তাহাকে এমনভাবে পাইতে চায় যাহাতে তাহার প্রিয়া শুধু তাহাকে দেহ দিবে না, দেহের সঙ্গে দিবে তাহার মনের সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত শ্রদ্ধা, তাহার হৃদয়-শতদলের সবটুকু মধু।

সভ্যমানবের কামনার এই যে সুন্দর সংযত প্রকাশ, তাহার ভালবাসার এই যে কমনীয়রূপ—ইহা sublimationএরই উদাহরণ। শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে sublimation ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে আদিম বর্ব্বর মানুষটা রহিয়াছে সেই বর্ব্বর মানুষটাকে উদার, সংযমী, ভদ্রমানুষে পরিণত করাই তো সাধনা। এই সাধনার পথে ব্রতী করাই শিক্ষার কাজ। Sublimationএর মূল্য কেবল শিক্ষার জগতে নহে, চিকিৎসার জগতেও উহার একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা আছে। যে সকল মানুষ মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত তাহাদের রোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে একটী সত্য আমাদের বুদ্ধিতে ধরা দেয়। সেই সত্যটী হইতেছে মনের ব্যাধির মূলে রহিয়াছে emotional problems. অনেক মানুষ আছে যাহাদের প্রবৃত্তির বেগ

অন্যান্য মানুষের তুলনায় অত্যধিক প্রবল। অল্প উত্তেজনার ফলেই তাহাদের প্রবৃত্তি বন্যার প্রচণ্ড জলধারার মত স্ফীত হইয়া উঠে—সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। যাহারা এইরূপ প্রবল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাদের জীবনে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। হৃদয় লইয়া তাহারা মহাফাঁপরে পড়িয়া যায়। উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগকে সংযত করিয়া কল্যাণের পথে তাহাকে পরিচালিত করা একেবারেই সহজ কার্য্য নহে। মানুষের ভাবপ্রবণতা যত বেশী এবং তাহার প্রবৃত্তির বেগ যত বলবতী হয় মঙ্গলের পথে সেই প্রবৃত্তির প্রচণ্ড ধারাকে পরিচালিত করা তাহার পক্ষে তত কঠিন হইয়া পড়ে। ভোগের একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই দেহ এবং মনের ক্ষতি অনিবার্য্য। কিন্তু ইহার অন্য একটা দিকও আছে। আমাদের মনের যে শক্তি তাহার উৎস হইতেছে আমাদের সহজ প্রবৃত্তি। এই জন্য দেখা যায়, যাহাদের প্রবৃত্তি খুব প্রবল তাহারা একদিকে যেমন চরম অন্যায় করিতে পারে আর একদিকে তেমনি চরম প্রতিভারও পরিচয় দিতে পারে। রত্নাকর হইয়া তাহারা একদিকে যেমন দস্যুতা করে—বাল্মীকি হইয়া তেমনি আর একদিকে রামায়ণের মত অমর মহাকাব্যের জন্ম দেয়। টলষ্টয় হইয়া প্রথম যৌবনে ব্যারাকে মদ খায় এবং জুয়া

খেলে—প্রথমবয়সের ভুল সংশোধন করিয়া আবার শুদ্ধ সংযত ঋষিরূপে জাতিকে নূতন করিয়া ভাবাইতে শিখায়, মানবতার চক্ষুর সম্মুখে সত্যের সিংহ-দুয়ার উদ্ঘাটিত করে। বিল্বমঙ্গল হইয়া দুরন্ত বাসনার টানে চরিত্রহীনা নারীর চরণে চরিত্র বিকাইয়া দেয়—আবার সেই বাসনাকে ভগবানের পানে ছুটাইয়া কখন সে নবজীবনের সোনার কাঠির পরশে রূপান্তরিত হইয়া যায়। প্রবল ভাবপ্রবণতা, বেগবতী প্রবৃত্তি না থাকিলে কোন বড় কাজ করা সম্ভবপর নহে। যাহারা বড় কবি বা বড় সমাজসংস্কারক তাহারা সবাই ভাবের পাগল। একটা পাগলামির নেশায় বিভোর হইয়া তাহারা আপনার পথে ছুটিয়া গিয়াছে। তাহারা হিসাব করে নাই, তর্ক করে নাই, দশে কি ভাবিতেছে, দশে কি বলিতেছে সে দিকে দৃষ্টি দেয় নাই। ভাবের জোয়ার তাহাদিগের চিত্তকে যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে—কোনদিকে দৃক্পাত না করিয়া তাহারা সেই দিকে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, পরমহংস, ম্যাজিনি, শেলী—ইহারা সব এক একজন পাগল—ভাবের পাগল—ক্ষ্যাপামির নেশায় আত্মহারা হইয়া একটা বিরাট আদর্শের পাদমূলে সমস্ত জীবন উজার করিয়া সঁপিয়া দিয়াছে। মানুষের ইতিহাসকে যাহারা যুগে যুগে নূতন করিয়া গড়িয়াছে তাহারা সকলেই এই আত্মভোলা ক্ষ্যাপার দলের মানুষ। অনেক সময় উদ্দাম ভাবপ্রবণতা

এবং প্রবল প্রবৃত্তি সত্ত্বেও বহু মানুষের জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। উৎকট মানসিক ব্যাধির দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার কারণ, তাহারা প্রবৃত্তিকে ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারে নাই, মনের শক্তিকে সন্তোষজনক পথে পরিচালিত করিবার কৌশল এবং সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। প্রবল প্রবৃত্তি আমাদের কাজে বেগ আনিয়া দেয়, আমাদের মনে উদ্যম এবং শক্তি সঞ্চারিত করে। সেই শক্তি, উদ্যম বা বীর্য্যের দ্বারা আমরা কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারি। যাহারা প্রবৃত্তির বেগকে কল্যাণপ্রদ কাজে লাগাইতে পারে তাহাদের জন্ম সার্থক হয়। যাহারা প্রবৃত্তির বেগকে কাজে লাগাইতে পারে না, তাহা হইতে উদ্যম এবং বীর্য্যসঞ্চয়ে অসমর্থ হয় তাহাদের দুর্দ্দমনীয় হৃদয়-বেগ তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। যে-প্রবৃত্তির বেগ সুপথে পরিচালিত হইয়া মানুষকে প্রতিভাশালী করে তাহাই বিপথে পরিচালিত হইয়া মানুষকে পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে Dr. Harrington-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

To do great work of any kind one must have powerful instincts to provide the energy necessary to carry the work through to success, and whether one so endowed achieve unusal success or develop a psychosis depends upon his ability to adjust, to direct the

forces of his mind into satisfactory channels. Thus it is that there is often but a narrow line separating genius from mental disease; that the most brilliant and illustrious families are often those most heavily loaded with insanity.

মানসিক ব্যাধির দ্বারা যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের নীরোগ হইবার কোন কালে আশা নাই, এরূপ ধারণা ভুল। সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে রোগী অনেক সময়ে সারিয়া যায়। মনের জীবনের সঙ্গে যাহার ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয় আছে এরূপ চিকিৎসক চেষ্টা করেন রোগীর প্রাণশক্তিকে (libido) উজ্জীবিত করিতে। মনের ক্ষমতাকে অবসাদের জগদ্দল পাথরের চাপ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর আদর্শের সেবায় নিয়োজিত করাই তো sublimation. মনে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া বা চিন্তা-জগতে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের ফলে মনের কল অনেক সময় বিকল হইয়া যায়। অন্তরের দুর্জ্জয় শক্তি মাজা-ভাঙা সাপের মত অসহায় ভাবে কেবল পাক খাইয়া মরে। সুচিকিৎসক অবসন্ন রোগীর অন্তরে শক্তির উৎসমুখ খুলিয়া দেয়। রোগীর অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত শক্তিকে (libido) তিনি জাগাইয়া দেন এবং উচ্চতর বিপুল আদর্শের সেবায় সেই শক্তিকে নিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করেন। Psycho-analystগণ ইহাকেই sublimation বলেন এবং মনের রোগে ইহাকেই মহৌষধ

রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। Psycho-analysisএর মূল্য, তাই, কেবল নিছক তত্ত্বের দিক দিয়া নহে; ব্যবহারিক জগতে প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়াও উহার একটা বিপুল সার্থকতা আছে।

———

পরিশিষ্ট

আজ সহস্র সহস্র মানুষের মনে একটী সমস্যা অত্যুগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সমস্যাটী হইতেছে—প্রকৃতির দাবীকে আমরা কতখানি স্বীকার করিব, কতখানিই বা অস্বীকার করিব। Repression বা অবদমনের পথে বিপদ রহিয়াছে; প্রকৃতির দাবীকে অবাধে পরিতৃপ্ত হইতে দেওয়ার মধ্যেও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। আসল কথা প্রকৃতির দাবীকে স্বীকারও করিতে হইবে, অস্বীকারও করিতে হইবে। তর্কশাস্ত্র অবশ্য এইরূপ পরস্পরবিরোধী মন্তব্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে না। কিন্তু জীবন তো ঠিক তর্কশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলে না। যাহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগের মধ্যে একটা সুন্দর সমন্বয় সাধনেই জীবনের সার্থকতা ফুটিয়া উঠে। যে ঐক্যতান সমস্ত জীবনকে একটা অপার্থিব মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, তাহার সৃষ্টি বিচিত্র সুরের সমন্বয় হইতে।

সমন্বয় সাধন না করিতে পারিলেই দুঃখ এবং বিফলতা। রাসেলের ভাষায়,—

"There is no ultimate satisfaction in the cultivation of one element of human nature at the expense of all the others, nor in viewing all the world as raw material for the magnificence of one's own ego."

আনাতোল ফ্রাঁসের প্যাফ্নুটিয়াস্ এই ব্যর্থতারই কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সন্ন্যাসী প্যাফ্নুটিয়াস মঠে বসিয়া বসিয়া ভাবিত কেবল নিজের অতীত জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা। সন্ন্যাসী রক্ত-মাংসের মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। দেহের যে একটা ন্যায্য দাবী আছে, সেই দাবীর মধ্যে সন্ন্যাসী পাপের কদর্য্যতাই শুধু দেখিয়াছিল। নারীর প্রতি প্রেমকে সে মনে করিত মানুষের একটা বিরাট দুর্ব্বলতা—যে দুর্ব্বলতার ক্ষমা নাই। Thaisএর গৃহে প্রেমের যে মূর্ত্তিটি সযত্নে রক্ষিত ছিল—হস্তীদন্তের সেই অপরূপ মূর্ত্তিটীকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে প্যাফ্নুটিয়াসের অন্তরে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না। Thais কতই না করুণ মিনতি জানাইল মূর্ত্তিটীকে না পোড়াইবার জন্য। প্রেম যে মানুষের একটা পরম ধর্ম্ম, ভালবাসিয়া মানুষ যে কখনো পাপ করিতে পারে না, একথা নারী সন্ন্যাসীর কাছে বারবার নিবেদন করিল—কিন্তু সে নিবেদন সন্ন্যাসীর কঠিন হৃদয়কে গলাইতে পারিল না। প্রকৃতির দাবীকে, প্রেমের মর্য্যাদাকে নির্দ্দয়ভাবে এমনি করিয়া আঘাত করিবার ফলে সন্ন্যাসীকে শেষ পর্য্যন্ত কি কঠোর প্রায়শ্চিত্তই না করিতে হইয়াছে! নারীর প্রতি ভালবাসা মানুষের চিত্তকে কলুষিত করে, ইহাই ছিল সন্ন্যাসীর ধারণা। এই কলুষের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সন্ন্যাসী যত চেষ্টা করিয়াছে, সমস্ত চেষ্টার অবসান

হইয়াছে একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতার মধ্যে। কামনাকে যতই সে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে গিয়াছে, কামনা ততই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সেই কামনা আসিয়াছে Thaisএর মূর্ত্তি ধরিয়া। দিবসে নিশীথে সকল সময়ে সর্ব্বত্র সন্ন্যাসীর হৃদয়ে জাগিতে লাগিল Thaisএর মধুমাখা ছবি। স্বপ্নে, জাগরণে, ধ্যানে, অধ্যয়নে, উপাসনায়—সকল অবস্থায় সন্ন্যাসী দেখিতে লাগিল Thaisকে। রাতে স্বপ্নে আসিয়া Thais সন্ন্যাসীকে আলিঙ্গন করে—সন্ন্যাসী জাগিয়া লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাকে। প্রেমের মূর্ত্তি একদিন যে অতিনিষ্ঠুর ভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল—প্রেম তাহাকে অতি নিষ্ঠুরভাবেই দগ্ধ করিয়া বিগত অপমানের প্রতিশোধ লইতে লাগিল। প্রকৃতি তাহার চরম পরিশোধ লইয়াছে Thais-এর মৃত্যুকালে। যে নারীর স্পর্শকে সন্ন্যাসী সর্পের মত এড়াইয়া চলিত, সেই নারীর মৃতদেহকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সন্ন্যাসী করুণ কণ্ঠে বলিতেছে,

"I love you, do not die ! Listen, my Thais. I have deceived you, and I was but a miserable fool. God, heaven both are nothing. Nothing is true but life on earth, and carnal love."

আহত অপমানিত প্রেম পরাজিত সন্ন্যাসীকে দিয়া অবশেষে বলাইয়াছে—মাটীর জীবন সত্য, দেহের ভালবাসা

সত্য—আর সব মিথ্যা! প্রকৃতির পরিশোধ চিরদিন এমনি ভীষণ, এমনি নির্ম্মম! অল্‌ডাস হাক্সলি ঠিকই লিখিয়াছেন,

Nemesis is the principle of equilibrium. If you don't balance yourself, the Gods will do your balancing for you—and do it with a vengence.

তবে কি প্রকৃতির দাবীকে আমরা ইচ্ছামত পরিতৃপ্ত করিব? দেহ যাহা চায়, তাহাই কি দেহকে দিব? প্রবৃত্তির দুর্ব্বার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিব? না। সেখানেও বিপদ। দেহের দাবী লইয়াই যদি আমরা সর্ব্বদার জন্য ব্যস্ত থাকি, তবে মনের রাজ্যে, জ্ঞানের রাজ্যে আমরা দেউলিয়া হইয়া যাইব। সংস্কৃতিই মনুষকে জানোয়ার হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। মানুষতো কেবল খায় না, বংশবৃদ্ধি করে না; মানুষ চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে; সেই স্বপ্নকে চিন্তাকে সে চিত্রের মধ্যে, গানের সুরের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, কল্যাণময় কাজের মধ্যে অমর করিয়া রাখিয়া যায়—সেই স্বপ্ন, সেই চিন্তা দেশে দেশে কালে কালে ছড়াইয়া পড়ে, মৃত এবং জীবিতের মধ্যে একটা জীবন্ত সম্পর্ক গড়িয়া তুলে। আদিম প্রকৃতি যদি মানুষের ইতিহাসকে আজও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত তবে ভাবের রাজ্যে মানুষের আজ দৈন্যের সীমা থাকিত না।

আসল কথা, Culture আর Nature—ইহার কোনটাকেই আমরা জীবন হইতে ছাঁটিয়া বাদ দিতে পারি না। ইহাদের

কোন একটিকে বর্জ্জন করিলেই জীবন ভরিয়া উঠে দীনতার হাহাকারে। প্রকৃতিকে সংযত করা চাই—কারণ তাহাকে সংযত না করিলে জীবনের বিচিত্র সুরের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়। আবার প্রকৃতিকে অতিরিক্ত পরিমাণে সংযত করিতে গিয়া আমরা ভিতরের উপবাসী জানোয়ারটাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলি। চাই উভয়ের মিলন।

আজও আমরা মানব-সভ্যতাকে সেই লোভনীয় স্বর্গে লইয়া যাইতে পারি নাই—যেখানে মাটীর সঙ্গে আকাশের মিল হইয়াছে—দেহের সঙ্গে আত্মার পরিণয় ঘটিয়াছে। আজও আমরা কোথাও কোথাও আত্মার নামে দেহের দাবীর গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করি—আবার কোথাও কোথাও বা দেহের দাবীকে অত্যন্ত বড় করিতে গিয়া আত্মার দাবীকে নিতান্তই ছোট করিয়া ফেলি। এই যে দেহের সঙ্গে আত্মার, অসুরের সঙ্গে সুরের, মাটির সঙ্গে আকাশের, Natureএর সঙ্গে Cultureএর, Instinctএর সঙ্গে Reasonএর, Life of impulseএর সঙ্গে Life of spiritএর আমরা সামঞ্জস্য করিতে পারিতেছি না—এইখানেই রহিয়াছে আমাদের অপূর্ণতার বেদনা। সামঞ্জস্যে যখন আমরা উপনীত হইব, তখন দেহের দাবী অথবা যৌন ক্ষুধাকে নিশ্চয়ই আমরা অস্বীকার করিব না—তখন কবির ভাষায় আমরা বলিব,—

"Through me forbidden voices,

Voices of sexes and lusts, voices veil'd and
I remove the veil,
Voices indescent by me clarified and transfigur'd."
—(*Whitman*).

"যে-কথার উপরে জাগিয়া আছে নিষেধের তর্জ্জনী তাহাকে ভাষা দিলাম আমি!

নরনারীর যৌনতত্ত্ব এবং কামনার কথা—যে সকল কথার উপরে এতদিন জাগিয়া ছিল নীরবতার যবনিকা, সেই যবনিকাকে অপসারিত করিলাম আমি!

যে-সব কথা অশ্লীল, তাহাদের অস্পষ্টতা দূরীভূত করিয়া সেগুলিকে নূতন মহিমা দান করিলাম আমি।"

যে কবি উপরের কথাগুলি লিখিয়াছেন দেহের দাবীকে স্বীকার করিয়া, সেই কবিই আবার সংযমের গৌরব কীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"I henceforth tread the world chaste, temperate, an early riser, a steady grower,......".

"এখন হইতে জগতের পথে আমি চলিব জিতেন্দ্রিয় এবং সংযমী হইয়া; অতি প্রভাতে আমি শয্যা ত্যাগ করিব, অবাধে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিব।"

Sex আর lustকে জীবনে উপযুক্ত আসন দেওয়ার যেমন একটা সার্থকতা আছে, chaste আর temperate হওয়ারও তেমনি একটা সার্থকতা আছে। এই সত্যকে ভুলিয়া গেলেই জীবন ভরিয়া উঠে ব্যর্থতার কান্নায়।

"It is enough to note that culture must somehow hit it off with nature. No mere compromise will do. There must be a happy marriage. In like measure will a sound morality come into being."

"প্রকৃতির সঙ্গে সংস্কৃতির গোঁজামিল দিলে কার্য্যোদ্ধার হইবেনা—Culture বা সংস্কৃতির সঙ্গে Nature বা প্রকৃতির চাই শুভ পরিণয়। যে নূতন ধর্ম্ম মানুষকে নবজীবনের অমৃত পরিবেশন করিবে সেই নূতন ধর্ম্ম জন্মলাভ করিবে এই শুভ পরিণয় হইতে।"

নিজের মধ্যে যতক্ষণ বিরোধের কোলাহল—ততক্ষণই আমরা অসুখী। আমাদের মনের অবচেতন প্রদেশে এমন সব সংস্কার সঞ্চিত হইয়া গোপনে অবস্থান করে যাহারা আমাদের আত্মপ্রকাশের পথে অন্তরায়। এই সব সংস্কার ছেলেবেলায় আমাদের মনের মধ্যে বাসা লয়—শৈশবে মা-ঠাকুরমা-পিসিমা পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে এমন সব ধারণা জন্মাইয়া দেয় জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে গেলে যাহাদের কোন মূল্য থাকে না। অমুক লোকটা অস্পৃশ্য, তাহাকে ছুঁইলে স্নান করিতে হয়—অমুক জিনিষ খাইলে মানুষ অপবিত্র হইয়া যায়—অমুক কাজ করিলে মানুষের কোটী কোটী বৎসর নরকভোগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না—এমনি সব কুসংস্কার আমাদের পাপপুণ্যের ধারণাকে গঠিত করে। রাসেলের ভাষায়,

Our nominal morality has been formulated by priests and mentally enslaved women.

আমাদের তথাকথিত নীতিধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিয়াছে পুরুত আর কুসংস্কারে জড়িত দুর্ব্বলমনা মেয়েরা। কথাটা খানিকটা যে সত্য—এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

এমনি একটা সংস্কার হইতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছে পাপের ধারণা। পাপ করিয়াছি—এমনি একটা ধারণা জন্মিলে মানুষ নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে। নিজের উপর যে মানুষ শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে তাহার মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। আমি পাপী এই ধারণা একবার জন্মিলে মানুষ উন্নত হওয়া দূরে থাকুক দিন দিন অবনতির ধাপে নামিয়া যায়। ইহা তাহাকে অসুখী করে—নিজের কাছে তাহাকে ছোট করিয়া দেয়। It makes a man unhappy and it makes him feel inferior. যে মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে সে মানুষকে দেখে ঈর্ষার চোখে। ছেলেবেলা হইতে এই যে সব সংস্কার আমাদের মনের অবচেতন প্রদেশে বাসা বাঁধিয়া থাকে এগুলি আমাদের জীবনকে ভরিয়া তুলে দীর্ঘশ্বাসে। বড় হইয়া আমরা নূতন চোখে সবকিছুকে যখন দেখিবার চেষ্টা করি তখন পুরাতন সংস্কারের কুজ্ঝটিকা আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে; আমাদের চেতন মন আমাদিগকে এক দিকে টানে—আমাদের অবচেতন প্রদেশের সংস্কার আমাদিগকে টানে ভিন্নদিকে। এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া

আমাদের ব্যক্তিত্ব হইয়া যায় পঙ্গু—আমাদের সুখের ঘরে লাগিয়া যায় আগুন। Nothing so much diminshes not only happiness but efficiency as a personality divided against itself.

আমাদের জীবনে বিরোধ যে কেবল চেতন এবং অবচেতনকে লইয়া তাহা নহে। নিজের ব্যক্তিগত সত্বার সঙ্গে বাহিরের বিপুল জগতের রহিয়াছে বিরোধ। আমরা নিজের চারিদিকে রচনা করি সুউচ্চ কারাপ্রাচীর; নিজের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের আশাআকাঙ্ক্ষার অচলায়তন নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজেকে করিয়া ফেলি বন্দী। আপনাকে বহু মানবের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারি না। তাই তো জীবন ভরিয়া উঠে না আনন্দে। নিজহাতেগড়া কারাগারে বসিয়া বসিয়া একলাটি দীর্ঘশ্বাস ফেলি আর অশ্রুমোচন করি। আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করি বিলিয়ার্ড বলের মত—কঠিন, আড়ষ্ট, স্বতন্ত্র। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের কারাপ্রাচীরকে ঘেঁসিয়া যে বিপুল জীবনস্রোত চলিয়াছে বিশালকায় নদের মত—সেই মহাবিশ্ব-জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারি না। তাই এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত বেদনা। Nothing is so dull as to be encased in self, nothing so exhilarating as to have attention and energy directed outwards.

সুখী মানুষ কে ? যাহার জীবনে নাই বিরোধ আর বিচ্ছেদের কোলাহল। নিজের সঙ্গে যেখানে নাই নিজের বিরোধ—নিজের সঙ্গে যেখানে নাই বিশ্বের বিচ্ছেদ সেইখানে আনন্দ। যেখানে ঐক্য আহত হয় না, মিলনের সুর কাটিয়া যায় না সেখানে জীবন ভরিয়া উঠে অপার্থিব সুষমায়। বাহিরের বিপুল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে এই যে গভীর যোগ—এই যোগ, এই ঐক্যই মানুষের জীবনকে ভরিয়া তুলে আনন্দে, সৌন্দর্য্যে, কল্যাণের প্রশান্ত মহিমায়। It is in snch profound instinctive union with the stream of life that the greatest joy is to be found.

———

লেখকের অন্যান্য পুস্তক

১।	সবহারাদের গান (৩য় সংস্করণ)	॥০
২।	বিদ্রোহীর স্বপ্ন (২য় সংস্করণ)	৸০
৩।	সাম্যবাদের গোড়ার কথা (২য় সংস্করণ)	১।০
৪।	কমিউনিজম্	৸০
৫।	মানুষের অধিকার (২য় সংস্করণ)	।০
৬।	সভ্যতার ব্যাধি	৵১০
৭।	রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ	১৲
৮।	মনের গভীরে	১৲
৯।	মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র	১৲
১০।	অগ্রদূত	১৲
১১।	রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র	৸০
১২।	স্বর্গের ঠিকানা	৸০
১৩।	সাম্যবাদের মর্ম্মকথা	॥০
১৪।	মরু-জয়ের সেনা	॥০
১৫।	ঘরের মায়া	।৵০
১৬।	সেনাপতি গান্ধী	।৵০
১৭।	রাসিয়ার কথা	।০

১৮। অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ ৵০
১৯। ত্রয়ী (২য় সংস্করণ) ।০
২০। বঙ্কিমের স্বপ্ন ৵০
২১। দ্রষ্টার চোখে ৵০
২২। ঝটিকার উর্দ্ধে ৵০
২৩। আমরা যাহা বিশ্বাস করি ।০
২৪। হ্যাভেলক এলিস ও যৌনবিজ্ঞান ৸০